প্রেরণা

– মিসবাহুর রহমান

হেমচন্দ্রের ভাষায় Love is the receprocity of heart. অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে বিনিময় – ভালোবাসা সেই। তাহলে যার প্রাণ নেই তার প্রতি কি ভালোবাসা হতে পারে না? নিশ্চয় পারে। তবে মানব–মানবীর প্রেমকে হেমচন্দ্র মহাশয় এভাবে বোঝাতে চেয়েছেন। মানুষের সঙ্গে জীব–জন্তুরও প্রেম হয়ে যায়। তখন একজনের সুখে অন্যে আনন্দ পায়। আবার একজনের দুঃখে অন্যে কষ্ট পায়।

আমার বড় ভাই মারা যাবার পর মা যখন পরের দিন কাদছিলেন তখন আমাদের পোষা হরিণটিকেও মায়ের পাশে দাড়িয়ে কাদতে দেখেছি। আবার অনেক দিনের পুরনো ব্যবহৃত জড়বস্তুর প্রতিও মায়া নামে এক প্রকার ভালোবাসা জন্মে যায়। ফলে উক্ত জড়বস্তুর অকস্মাৎ কোনো ক্ষতি সাধিত হলে আমরা ব্যথা পাই। অনেক সময় উত্তেজিতও হয়ে পড়ি।

দেখা যাচ্ছে ভালোবাসার প্রকারভেদ আছে। তাহলে সবচেয়ে বড় ভালোবাসা কোনটি? এ বিষয়ে বড়সড়ো একটা বিতর্ক হতে পারে। তবে ইতিহাস বলছে, ইসলাম ধর্ম এবং দেশ মাতৃকার প্রতি ভালোবাসায় যতো সহজে হাজার হাজার লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন অন্য কোনো ভালোবাসায় তার নজির নেই। এই তো ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লাখ লোক হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন কয়েক লাখ। তখন অনেক প্রেমিক তাদের প্রেমিকার চেয়ে দেশমার্তৃকার প্রতি ভালোবাসা বড় করে দেখে মুক্তিযুদ্ধে গেছেন। প্রেমিকাও উদ্বুদ্ধ করেছেন যুদ্ধে যেতে। পরে আর ফিরে আসা হয়নি অনেকের। অর্থাৎ বলা যায়, মানব–মানবীর প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম, ধর্মপ্রেম অনেক বড়।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট মনে হয় বদলে গেছে। সততা, নীতি–নৈতিকতার চেয়ে অসততা, অনিয়মতান্ত্রিকতার প্রভাব বড় হয়ে গেছে। দেখা যায়, একজন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তার কাছে তার অধীনস্থ নীতিবান উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তার চেয়ে একই পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তার প্রতি ভালোবাসা নামের টান অনেক বেশি। সেখান থেকে নানান রকম ব্যক্তির স্বার্থ হাসিল হয়। আবার একজন দলপ্রেমীর কাছে দেশের স্বার্থের চেয়ে দলপ্রীতি অনেক বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এমনকি দলীয় স্বার্থে বা বিপক্ষ দলের প্রতি হিংসায় কেউ কেউ দেশের স্বার্থহানি বা বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। সেখানেও অবশ্য প্রেম–প্রীতিই কাজ করছে। তবে বড় প্রেম নয় – ছোট প্রেম, হিংসাত্মক প্রেম।

যুক্তিবাদীরা হয়তো তর্ক জুড়ে দেবেন যে, দলকে তাহলে কি ভালোবাসা যাবে না! অবশ্যই যাবে। তবে দেশের স্বার্থহানি ঘটিয়ে অবশ্যই নয়। অন্যের অনিষ্ট করে কি বড় হওয়া, ক্ষমতাবান হওয়া সঙ্গত? তাই যদি হবে তো চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি সবই তো বৈধ হয়ে যাবে।

কথাশিল্পী শরৎবাবু লিখেছেন, *পা থাকলেই হাটা যায় কিন্তু হাত থাকলেই তো লেখা যায় না।* বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট বলছে, হাত থাকলেই লেখা যায় এবং যা ইচ্ছা তা লেখা যায়। তাতে অন্যের যা হয় হোক, দেশের ক্ষতি হয় হোক। তেমনি মুখ থাকলেই যা ইচ্ছা তা বলা যায়। তা নীতি–নৈতিকতা বর্জিতই হোক আর শ্লীল–অশ্লীলই হোক। তবে সমস্যা হলো, কান থাকলেই সব শুনতে

হবে তাতে যে আমরা বিশ্বাসী নই। চোখ থাকলেই সব দেখতে হবে তা তো হতে পারে না। আমরা অশ্লীল কথা যে শুনতে চাই না। দেশের স্বার্থ হানিকর লেখা যে পড়তে চাই না।

আমরা জানতে চাই সেই ভালোবাসার কথা যা অন্যকে কষ্ট দেয় না, আঘাত করে না। দেশের স্বার্থকে বিসর্জন দেয় না। পড়তে চাই সেই ভালোবাসা মিশ্রিত লেখা যা নীতি বিবর্জিত নয়, রীতিশুদ্ধ। শুনতে চাই সেই শ্লীল কথা যা উদ্বুদ্ধ করে অনুপ্রেরণা যোগায় ব্যক্তি বা দলকে নয়, সকলকে ভালোবাসার। ভালোবাসা দিবসের অঙ্গীকার হোক বড় প্রেম, বড় ভালোবাসার।

মালগ্রাম দক্ষিণপাড়া, বগুড়া থেকে

এক পলকে

– ইন্তেখার দিনার ধ্রুব

এখন টেক্সটাইল ডিপ্লোমা পড়ছি। সেই সুবাদে আমাকে মিরসরাই অর্থাৎ কলেজের কাছে মেসে থাকতে হয়। গত বছর ১৩ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ করে আমার ভাগ্নি কলেজে ফোন করলো এবং আমাকে বললো, আপনার জন্য সারপ্রাইজ আছে, তাড়াতাড়ি বাসায় আসুন।

ভাগ্নির সঙ্গে ফৃ ছিলাম। যে কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে সে বন্ধুসুলভ আলোচনা করতো। সেই জন্যই হয়তো ছয়টি মামার মধ্যে সে আমাকে পছন্দ করতো বেশি। যাক, পরদিন অর্থাৎ ১৪ ফেব্রুয়ারি গেলাম আপার বাসা *অলংকারে।*

ভাগ্নি বললো, আমার সঙ্গে আপনি স্কুলে যাবেন।

কিছু না জেনেই গেলাম তাদের ইস্পাহানি স্কুলে।

সবাই তখন মামা মামা বলে পরিচিত হলো। কেউ কেউ চকলেট, গোলাপ, কাচামরিচ উপহার দিল। আমিও মোটামুটি কিছুটা আনন্দ উপভোগ করে ভাগ্নিকে নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়।

সে তখন বললো, আপনার কাকে পছন্দ হলো? আপনার ছবি দেখে আগেই ইমু ও রোজি পছন্দ করেছে আপনাকে। আপনাকে তারা সরাসরি দেখতে চাইলো। তাই এই পদ্ধতি।

তখন বুঝলাম ভাগ্নি আমার ছবি তার বান্ধবীদের দেখিয়েছে। তবে মনে মনে নিজেকে মডেল তারকা বলে মনে হলো। এখন কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

সে বললো, আপনাকে যে কাচামরিচ দিয়েছে তাকে নেবেন? নাকি গোলাপ যে দিয়েছে তাকে নেবেন? আমি তখন কারো চেহারাই মনে করতে পারছিলাম না। ভাগ্যের পরীক্ষা দেয়ার মতো বললাম, কাচামরিচ নেবো।

ভাগ্নি তো মহাখুশি। সে বললো, আমার পছন্দ ধরতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ।

পরদিন সে গিয়ে কাচামরিচ অর্থাৎ রোজিকে বললো ঘটনা। এবং আমার জন্য ছবি নিয়ে এলো। তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করছি বার বার। যখন ছবি দেখলাম তখন মনে হলো, অনেক বড় কিছু পেয়েছি জীবনে। এতোদিন হয়তো এ রোজির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

পরে তার সঙ্গে দেখা করলাম। সে তখন লজ্জায় কোনো কথাই বলেনি। এদিকে আবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ছিল আমার জন্মদিন। সে এই জন্মদিন উপলক্ষে আমাকে গিফট দিল। আমি তো কোনো

রাজ্য জয় করেছি বলে মনে হলো। এদিকে কলেজ ফাকি দিচ্ছি বলে আমায় পাঠিয়ে দিলেন আপা। তখন মহাআনন্দে চলে এলাম আবার মেসে।

মেসে আসার পর যখন বন্ধুদের ঘটনা বললাম তখন তারাও মহাখুশি হলো। তবে এই খুশির খেসারত হিসেবে আমার পকেট খালি হলো আর কি।

এরপর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুহিত ও হাসান হঠাৎ একদিন বললো, ধ্রুব চলো চট্টগ্রাম শহর যাবো।

ভাবলাম যাক, গেলে তো আমারও লাভ আছে। দিনটি ছিল ৫ মার্চ। আমরা তিনজন মিলে ভাগনির স্কুলে গেলাম। আমাকে দেখে রোজি অবাক। তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হচ্ছিল না। আমরা তাদের নিয়ে পাহাড়তলি লেকে গেলাম। রোজিকে নিয়ে একটি বেঞ্চেতে বসলাম।

জীবনে প্রথম কোনো মেয়ের পাশে এভাবে বসতে পেরে নিজেকে খুব গর্বিত মনে হলো। দুজনেই চুপচাপ থাকলাম অনেকক্ষণ। আমি যখন কথা বলবো বলে আওয়াজ করতেই সে সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাইলো। আমি চুপ তো সে নিজেও চুপ। এভাবে অনেকক্ষণ। চোরাচোখে তাকে দেখতে লাগলাম। সে মাথা নিচু করে বসে রইলো।

বললাম, কিছু বলছো না যে।

রোজি বললো, আপনি বলেন, আমি শুধু শুনবো।

বললাম, এখানে এসেছো কেন?

বললো, আপনি যে কারণে এসেছেন।

তার মুখটা লাল টুকটুকে গোলাপের মতো লাগছিল বলে বার বার তার দিকে চোরাচোখে তাকাচ্ছিলাম।

শেষে সে ধরতে পেরে বললো, কি দেখছেন অমন করে?

বললাম, তোমাকে দেখছি, পৃথিবীর এতোগুলো মানবীর মধ্যে তুমিই আমার অর্ধাঙ্গিনী হবে। তাই তোমাকে দেখছি মন ভরে।

আপনাকে সুখী করতে পারবো তো? আমাদের মাঝে যদি কোনো বাধা আসে?

বললাম, আমার ও তোমার সম্পর্কটি যখন কাকতালীয়ভাবে সম্পন্ন হলো তখন এতে খোদাতাআলার নিশ্চয়ই কোনো মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে। না হলে আল্লাহ আমাদের এভাবে এক করে দিলেন কেন?

এভাবে অনেক কথার পর বললাম, আই লাভ ইউ। এর বাংলাটা বলো তো।

সে তখন সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি তো জানি না। আমি ইংরেজিতে বেশ কাচা। তাই কাল থেকে আপনার কাছে প্রাইভেট পড়বো।

এরপর দুজনেই হেসে ফেললাম। এদিকে ভাগনি ও আমার বন্ধুরা তাগাদা দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি আমাদের মোলাকাত শেষ করার জন্য। তাই শেষে আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে রোজি বললো, আপনি ভালোভাবে পড়াশোনা করে নিজের সুনাম গড়ে তুলুন। কারণ এখন আপনি আর একা নন, আমিও আপনার চলার সঙ্গী।

তাকে কথা দিয়ে তবেই হাত ছাড়লাম। এরপর আমরা তিনজন অর্থাৎ তিন বন্ধু তাদের বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে আবার মেসে ফিরলাম।

পরের দিনই ফোনে জানলাম দুলাভাই সব জেনে গেছেন। কারণ ওখানে অর্থাৎ লেকে দুলাভাইয়ের বন্ধুর দোকান ছিল যা আমরা আগে জানতাম না। এই নিয়ে অনেক অপমানিত হলাম। কারণ ভাগনিকে এসব কাজে জড়িয়েছি বলে।

এখন আপার বাসায় যাওয়াটা আমার বন্ধ। এই মুখ নিয়ে কিভাবে যাই? আবেগের বশে আনন্দের সীমা লঙ্ঘন করেছি বলে হয়তো আজ আমার আপার সামনে যেতে লজ্জা লাগে। দুলাভাই কথা বলেন না। মোটামুটি আমাদের পরিবারের সবাই একে একে জেনেছে।

তবুও রোজিকে ভালোবাসি এবং ভালোবাসবো চিরকাল।

চট্টগ্রাম থেকে

সন্দেহ

দীর্ঘ দিন ঢাকায় বাস করি। বহু ঘটনা বহু রটনার সঙ্গে এ জীবন সম্পৃক্ত। একদিন দেখলাম যাযাদি ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে লেখা আহ্বান করেছে। ভাবলাম কি লিখি? তবে আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা আমাকে বার বার নাড়া দেয়। না বললেই যেন নয়। কৌতূহল হয় নিজেকে নিয়ে।

ঢাকায় বাড়ি এবং ভালো চাকরিও আছে। আমার বাড়িতে দুই চারটি ফ্যামিলি ভাড়াও থাকে। তারাও ভালো চাকরি করে। কিন্তু একজন লোক ডে-নাইট অর্থাৎ শিফটিং ডিউটি করে। তারা প্রতি বছরই ম্যারেজ ডে পালন করে। আমিও তাদের অতিথির সঙ্গে নিয়মিত উপস্থিত হই। দম্পতি বেশ স্মার্ট ও সুখী। কোনো সন্তান নেই।

আমারও নতুন সংসার। ছেলেমেয়ে হয়নি। ঝুট-ঝামেলাও নেই। মোট কথা সবাই টোনাটুনি। বৌ আমার বাপের বাড়িতে থাকে আবার আমার সঙ্গেও থাকে। কখনো মাস, দুই মাস এভাবে।

ওই দম্পতির তৃতীয় বিয়ে বার্ষিকীর কথা। রীতি মতো নিমন্ত্রণ হলো। একাই সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দোতলার কলিংবেল টিপতেই ভাবী আমাকে রিসিভ করলেন। ভেতরে কোলাহলমুক্ত পরিবেশ। কোনো অতিথি নেই।

অবাক হলাম। কিছু বলার আগেই ভাবী আমাকে বললেন, কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি। সাহেবও নাইট ডিউটিতে চলে গেছে, সকালে ফিরবে। অকপটে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, ভাবী, তাহলে আপনি একা?

ভাবী আমার হাত ধরে তার বেডরুমে নিয়ে গেলেন এবং দ্রুত তার শরীরের সব কাপড় খুলে ফেললেন। আমি তো অবাক। নগ্ন দেহে আমাকে জড়িয়ে কেদে ফেললেন।

তিনি বললেন, আমার সাহেব প্রতিদিন আপনাকে নিয়ে কতোগুলো মিথ্যা কথা বলে। আমি হাজার কিরা-কসম কাটলেও বিশ্বাস করে না। দুপুরে অফিসে যাওয়ার সময় আপনাকে নিয়ে বিয়েবার্ষিকী পালন করতে বলেছে। তাই আমি এ ব্যবস্থা করেছি। আপনি আমাকে ইচ্ছামতো ভোগ করুন। আমার স্বামীর সন্দেহের সমাপ্তি ঘটুক। কারণ আমাদের দাম্পত্য জীবন খুবই সন্দেহপ্রবণ। তার সন্দেহমূলক কথা শুনতে শুনতে আমার দুটি কান ঝালাপালা। আপনাকে নিয়ে তার নোংরা কথা সত্যে পরিণত হোক। আপনার কোনো চিন্তা নেই। যা হবে আমার জীবনের ওপর এতে সংসার থাক বা না

থাক। তার ওপর আমার এটাই চরম প্রতিশোধ। আপনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আজ আপনি কোনোক্রমেই না করবেন না। আমি জানি ভাবী বাসায় নেই। তাই আপনি ইচ্ছা করলে সারা রাত আমার পাশে থাকতে পারবেন।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মহিলার দৃঢ় চাহনিতে এবং নগ্ন দেহের স্পর্শে আমার সমস্ত শরীর একাকার হয়ে গেল। যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া ছিল কঠিন। ভাবলাম, শুধু ভাবলাম। তাদের নিয়েই ভাবলাম।

হা-য়-রে ভালো-বাসা আর ভা-লো-বা-সা-র বিয়ে।

নাম ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

চাওয়া- পাওয়া

– টুকটুকি

নিজের সুখের জন্য নয়। একমাত্র বাবা মায়ের ইচ্ছাকে দাম দিতে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। হ্যা, শুধু মা-বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই আমার জীবনের সমস্ত সুখ-আশা-ভালোবাসা নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছি। আর আমার সমস্ত সুখ, আশা ভালোবাসা ছিল একজনই। আমি তার নাম বলছি না। তবে আমার বান্ধবীরা তাকে সাথী বলেই ডাকতো।

সাথীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সময় বুঝতেই পারিনি সে হবে আমার জীবনের একটা অংশ। পরিচয়ের কিছুদিন পরেই তার কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। তাতে ছিল ভালোবাসার আকুতি ভরা। আমিও মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিততে পারলাম না। না বুঝেই আবেগের বসে তাকে আমার সম্মতির কথা জানালাম। শুরু হলো আমাদের ভালোবাসার গল্প। হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসতে শুরু করলাম একে অপরকে ভালোভাবে না জেনেই। কিছুদিন পর জানতে পারলাম সে ম্যাট্রিক পাস। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কারণ ম্যাট্রিক পাস ছেলে আমাদের পরিবারে কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তাকে পড়াশোনা শুরু করতে বললাম। অন্তত বিএ পাস করতে হবে।

সে আমাকে কথা দিল আগামী জানুয়ারি থেকেই পড়াশোনা শুরু করবে। শুনে মনে মনে আশ্বস্ত হলাম। এর কিছুদিন পরেই এলো ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২ অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। সে হয়তো জানতোই না ভ্যালেন্টাইনস ডে কি। আমিই তাকে বোঝালাম এর মর্ম। আমরা ঠিক করলাম ১৪ ফেব্রুয়ারিতে পদ্মার চরে বেড়াতে যাবো।

আমি সকাল সকাল তার দেয়া শাড়িটি পরে বাসা থেকে বের হলাম। আমি, সে আর আমার দুইজন ফ্রেন্ড মিলে পদ্মার চরে ঘুরতে গেলাম। সেখানে অনেক মজা করেছিলাম। সেদিনই প্রথম ভালোবাসা দিবসের মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। কারণ সেদিন ভালোবাসা দেয়া বা নেয়ার মতো মানুষ পাশে ছিল। ধীরে ধীরে সময় চলে যেতে লাগলো। এক সময় আমাদের সম্পর্কের কথা বাসায় সবাই জেনে গেল। সবাই ধিক্কার দিতে লাগলো আমাকে। কারণ সাথী দেখতে তেমন সুন্দর বা স্মার্ট ছিল না। তার মধ্যে ম্যাট্রিক পাস। আমাকে বাসার প্রত্যেকটি মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হলো কেন

আমি এমন অশিক্ষিত, অসুন্দর, আনস্মার্ট ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক করলাম। কিন্তু সম্পর্ক যে বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে হয় না তা তাদের কিভাবে বোঝাই।

আমাকে নিয়ে আমার পরিবারের অনেক স্বপ্ন, আমাকে রাজপুত্রের মতো ছেলের কাছে বিয়ে দেবে। কিন্তু আমি কি পারবো সেই রাজপুত্রের সঙ্গে সুখী হতে। আমার বাবা আমাকে হুমকি দিয়েছেন সাথীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। তাই বাধ্য হয়েই তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। সে বলেছিল, জানুয়ারি মাস থেকে পড়াশোনা শুরু করবে। সেই সময়ও আমি তাকে দিতে পারিনি। বড় নিষ্ঠুরভাবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। জানি সে আমাকে ভুল বুঝেছে। তবে আমি নিরুপায়।

আবার ভালোবাসা দিবস আসছে। আজ সে আমার কাছে নেই। নিজেকে বড় শূন্য মনে হয়। মাঝে মধ্যে চিৎকার করে কাদি। তাতে তো কোনো লাভ হয় না। বাবা-মাকে কথা দিয়েছি তাকে ভুলে যাবো। কিন্তু সত্যিই কি তাকে ভুলে যেতে পারবো! যার সঙ্গে এতোগুলো স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে তাকে কি ভুলে থাকা যায়? জানি না বাবা-মায়েরা এতো সুন্দর, স্মার্ট, শিক্ষিত ছেলে খোজেন কেন? পৃথিবীতে সব সুন্দর, স্মার্ট ও শিক্ষিত লোকেরাই কি সুখী হতে পারে! আমি কি পারবো অশিক্ষিত, অসুন্দর, আনস্মার্ট সাথীকে ভুলে গিয়ে বাবা মায়ের পছন্দের রাজপুত্রের সঙ্গে সুখী হতে?

মাঝে মধ্যে ভীষণ কষ্ট হয় সাথীর জন্য। ওর তো কোনো দোষ ছিল না। সে দেখতে অসুন্দর, আনস্মার্ট এটাই কি তার দোষ? জানি না যাযাদি এই লেখাট ছাপবে কি না। তবে যদি ছাপে তাহলে আমি উপকৃত হবো। কারণ সাথীকে যখন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তখন কি বলেছিলাম ফোনে তা মনে নেই। তাই যাযাদি এই লেখাটি ছাপলে তার কাছে ক্ষমা চাওয়ার একটি সুযোগ করে দেবে। যদি যাযাদি এই লেখাটি ছাপে তাহলে সাথীকে বলছি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমাকে ভুল বুঝো না। প্লিজ, আমাকে অভিশাপ দিও না। একটু আর্শীবাদ করো যাতে তোমার টুকটুকি সুখী হতে পারে। এবং তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ, আমার জন্য নিজেকে শেষ করে দিও না। নিজেকে তৈরি করো অন্য কারো জন্য।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারাই বলুন, কে না চায় একটি সুন্দর সংসার। কে না চায় স্বামীর সোহাগী হতে। স্বপ্ন দেখতে তো কোনো দোষ নেই। তাই আমিও আগামীর স্বপ্নেই বিভোর থাকতে চাই। আজ আমি বড় একা। এখন তোমার মতো অন্য কেউ ফোন করে জানতে চাইবে না আমি কেমন আছি। ভাত খেয়েছি কি না, পড়াশোনা ঠিক মতো চলছে কি না। বড় কষ্ট হয় যখন এই সব কথা ভাবি। এখন অপেক্ষায় আছি আমার বাবা মায়ের পছন্দের রাজপুত্রের। জানি না কবে আমার বিয়ে হবে। বিয়ের আগে যতোগুলো ১৪ ফেব্রুয়ারি আসবে আমাকে একা একাই কাটাতে হবে।

এখন আল্লাহর কাছে একটাই চাওয়া আমার স্বামীটি যেন খুব ভালো হয়। একদম সাথীর মতো। আর আমার স্বামীটি যেন আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। আমার স্বামীর সঙ্গে যেন আমি মানিয়ে নিতে পারি এটাই আমার চাওয়া

তবুও মাঝে মধ্যে রাতে ঘুমোতে গেলে সাথীর কথা ভীষণ মনে পড়ে।

চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যায়।

তখন মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিই পৃথিবীতে সবাই সব কিছু পায় না।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, ঢাকা থেকে

বাসনা সাধন

– রোমার

তিন তলার ভাড়াটে রিতাভাবী। স্বামী কানাডা-য় থাকেন। কানাডায় চলে যাবেন খুব শিগগির। একমাত্র মেয়ের বয়স সাত বছর। বাচ্চাকে ভালো স্কুলে পড়ানোর জন্যই বাসা ভাড়া নিয়েছেন। আব্বা-আম্মার সঙ্গে খুবই ভালো সম্পর্ক। ছয় মাস হলো ভাড়া আছেন। কিন্তু আমার সঙ্গে দুই এক দিন কথা হয়েছে। সিড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় দেখা হয়, ব্যস এটুকুই।

সকালবেলা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় আম্মা আদেশ দিলেন, রিতার শরীরটা ভালো না। তাই মার্কেটে যেতে পারছেন না। তুমি একটু তার কয়েকটা জিনিস কিনে দিও।

আম্মার আদেশের বরখেলাপের সাহস না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃতীয় তলার দরজায় নক করলাম। দরজা খুললেন রীতাভাবী।

ও তুমি। নিশ্চয়ই খালা পাঠিয়েছেন। ভীষণ কষ্টে আছি। যদি দয়া করে একটু উপকার করে দাও।

না, না কষ্টের কি আছে। আজ কোনো কাজ নেই। দিন কি কিনতে হবে।

একটু বসো, লিস্ট ও টাকা দিচ্ছি। নিউ মার্কেটের কসমেটিকসের দোকানে সব পাবে। বলেই রিতাভাবী বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন, ফিরলেন লিস্ট ও টাকা নিয়ে।

সারাদিন আড্ডা দিয়ে দুপুরে নিউ মার্কেটে পরিচিত দোকানে গিয়ে লিস্টটা দিয়ে বললাম, মালগুলো দিন তো। দোকানি লিস্ট অনুসারে মাল নামাচ্ছে এবং দাম হিসাব করছে। বাদ সাধলো ব্রেসিয়ারের নাম্বারে এসে।

কতো নাম্বার?

আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বললাম, তা তো জানি না।

কার এটা? কেমন মোটা?

আমার চাচির। মিথ্যা বললাম।

বয়স্ক মহিলা। অবশ্যই বেয়াল্লিশ চৌচল্লিশ হবে। ঠিক আছে। তুমি বিয়াল্লিশ নিয়ে যাও। ছোট হলে চেঞ্জ করে নিও।

আচ্ছা, বলে মাল নিয়ে চলে এলাম।

বাসায় এসে রিতাভাবীকে কোনো কথা না বলে প্যাকেটটা ও বেচে যাওয়া তিনশ পচাত্তর টাকা ফেরত দিলাম।

শুধু প্যাকেটটা নিয়ে বললেন, টাকা ফেরত দিও না। এটা তুমি চা, মিষ্টি খেও।

টাকা না নিতে চাইলে ভাবী রাগ করলেন। অগত্যা নিতেই হলো। বাসায় এসে কাপড় খুলতেই মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন রিতাভাবী। উপরে গিয়েই মেয়েকে পড়তে বসতে বলে ড্রয়িংরুমে আসতে নিষেধ করলেন। আমাকে ড্রয়িংরুমে বসতে বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন ভাবী।

আমি একটা পত্রিকা নিয়ে পড়ায় মনোনিবেশ করলাম। ভাবীর ডাকে সংবিৎ ফিরে পেলাম।

এই, এটা কি নিয়ে এসেছো। একটা ব্রা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন ভাবী।

কেন, আপনার লিস্টে তো লেখা ছিল।

তা ছিল। কিন্তু এতো বড় সাইজের কেন?
আপনি তো নাম্বার লিখে দেননি।
তা দেইনি। কিন্তু তোমারও তো আন্দাজ থাকা দরকার।
আমি কিভাবে আন্দাজ করবো।
বোকা কোথাকার। বলেই ভাবী শাড়ির আচলটা ফেলে দিলেন।
খালি ব্রা পরে এক দেবী যেন আমায় সামনে দাড়িয়ে! উত্তেজনায় গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো।
মাপ নিয়ে বদলিয়ে নিয়ে এসো। ভাবীর মুচকি হাসি।
কোথায় মাপ নেবো?
এখানটায়। বলেই স্তন দুটো হাত দিয়ে উচু করে ধরলেন।
আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। ভাবীকে চেপে ধরলাম। ভাবীও উত্তেজনায় কাপতে কাপতে আমার বুকে আত্মসমর্পণ করলেন। সোফার ওপরই শুরু হলো লীলাখেলা।
দিন যায়, মাস যায়। ভাবীর দেয়া টাকায় আমার অবস্থা রাজার মতো। দুজন দুজনকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ভাবী অনেক আশার বাণী শোনান। কানাডা গিয়ে একটা চাকরি নিয়েই ভাইকে ডিভোর্স দেবেন। পরে আমাকে কানাডায় নিয়ে যাবেন এবং বিয়ে করবেন। আর আমিও কানাডা যাওয়ার আশায় ভাবীকে খুশি করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি।
বছর পেরিয়ে গেল। হঠাৎ একদিন ভাবীর কানাডা যাওয়ার কাগজ এলো। ভাবীকে খুবই খুশি মনে হলো। ঢাকায় গিয়ে টিকেট কনফার্ম করে এলেন। ঢাকায় গেলাম তুলে দেয়ার জন্য।
এয়ারপোর্টে আমাকে আলাদাভাবে নির্জনে ভাবী ডেকে নিলেন। কেউ নেই। শুধু আমি আর ভাবী। আমাকে চেপে ধরে আলতো করে একটু চুমু দিলেন। ব্যাগ থেকে হলুদ খামের একটা চিঠি দিয়ে বললেন, আমি চলে গেলে পড়বে।
আচ্ছা। চিঠিটা পকেটে রেখে দিলাম।
যথাসময়ে ফ্লাইট চলে গেল। বাসায় এসে ভাবীর নির্দেশ মতো চিঠি খুললাম। কিন্তু একি লেখা :
রোমার,
শুভেচ্ছা নিও। তুমি বেশি বোকা। জানি আমাকে ভীষণ ভালোবাসো। কিন্তু ভালোবাসার সংজ্ঞা জানো না। আমার কাছে ভালোবাসা মানে –
ভা – ভাবিয়ে ভাবিয়ে।
লো – লোভ দেখিয়ে।
বা – বাসনা।
সা – সাধনা।
ইতি–
রিতা

বগুড়া থেকে

বন্ধুবাবা

– মনজুর মোরশেদ কাওছার

ভালোবাসা দিবসকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি। কারণ জীবনে এমন এক মায়াময় ভালোবাসার জন্ম হয়েছে যার অনুভূতি আমার এই অপরিপক্ক হাতের কলমের আচড়ে বোঝাতে পারবো না। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার জন্ম। একজনের অন্তরে আরেকজনের প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি কখন, কিভাবে হবে কেউ কখনো বলতে পারবে না।

আমার ভালোবাসার সৃষ্টি একজন অসুস্থ ছেলের প্রতি। ছেলেটির মাঝে মধ্যেই শ্বাসকষ্ট হয়। অনেক সময় অক্সিজেন নেয়ার পর্যায়ে চলে যায়। এগারো বছর বয়সে এই ছেলেটির সঙ্গে আমার পরিচয় টেলিফোনের মাধ্যমে। পরিচয় হওয়ারও অনেক দিন পর খুবই অসুস্থ হওয়াতে তাকে দেখতে তাদের বাসায় যাই। প্রথম দেখা। অসুস্থ ছেলেটির মুখটি দেখে গভীর মমতায় মনটা কেদে ওঠে। তাৎক্ষণিকভাবেই মনে মনে ছেলেটিকে আমার সন্তানের আসনে বসিয়ে দিই।

অদ্ভুত সুন্দর একটি হাসি দিয়ে আমাকে সে স্বাগত জানায়। অসুস্থতার জন্য ঠিক মতো কথাও বলতে পারছিল না। শ্বাস নিতে তার খুবই কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও খুশির অতিশয্যে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল। আমার প্রতি ছেলেটির আন্তরিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দেখে চোখে পানি এসে গেল। গভীর মমতায় ছেলেটির কপালে একটি চুমু দিয়ে আমার বুকে জড়িয়ে রাখি।

সব সময় তাকে বাবা বলে ডাকি। আমার প্রতি ছেলেটির টেলিফোনে প্রতিদিনকার বাক্য বন্ধুবাবা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

পরম মমতায় তখন আমার মনটা ভরে যায়। স্বর্গীয় সুখ অনুভব করি ছেলেটির শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়। যখনই তাদের বাসায় যাই, বন্ধুবাবা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার মস্ত দুঃখ–কষ্ট দূর হয়ে যায়। হাজারও কষ্টের মাঝে ছোট্ট এই ছেলেটি আমার এক টুকরো সুখ। আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে ছেলেটি বিচরণ করে। আমার এই ছোট্ট বাবাকে খু–ব ভালোবাসি।

কালীগঞ্জ, ঢাকা থেকে

বোধ

– আলফাজউদ্দীন

ভালোবাসা কি? ভালোবাসা একটা অনুভূতি। আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা, বাবা মায়ের প্রতি, সমাজ তথা দেশের প্রতি। এসবের প্রতি ভালোবাসা আলাদা আলাদা অনুভূতি এবং চিন্তা কাজ করে। আর একটা ভালোবাসা সেটা হলো নরনারীর ভালোবাসা। এই লেখা নরনারীকে নিয়ে।

নর ও নারীর দেহ এবং মন নিয়ে গড়ে উঠে ভালোবাসা আবার তিক্ততা। বিবাহিত জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে এগুলো গড়ে ওঠে। আমি বিয়ে করি আলোচনার মাধ্যমে। আমার এক বন্ধুর জন্য একটা বিয়ের প্রস্তাব আসে সেটা আমার দিকে ঠেলে দিল। অন্য বন্ধুরা এটা লুফে নিয়ে আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করলো মেয়ে দেখার জন্য। মেয়ের বাড়ি প্রস্তাবকের নিকট প্রতিবেশী। অতএব তার বাড়ি থেকে গোপনে মেয়ে দেখার ব্যবস্থা হলো। একটু দূরে থেকে মেয়ে দেখা যদিও একটা ঝুকি থেকে যায় তবুও

রাজি হয়ে গেলাম। মেয়ে দেখা হলো, সকলের পছন্দ। *দশ চক্রে ভগবান ভূত।* আমারও সে অবস্থা হলো। আমার অভিভাবককে তারা জানালো। বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের প্রথম রাত অর্থাৎ বাসর রাত। আমরা উভয় উভয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দেখলাম বেশ ফর্শা। তার গায়ে হাত দেয়া মাত্র আমার অনুভূতিতে একটা মোচড় খেল। তার সমস্ত শরীর খসখসে, মসৃণতার লেশমাত্র নেই। শরীরে মাংস এতোই অপ্রতুল যেন চামড়া কুচকে আছে। বললাম, শুয়ে পড়ো, তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

বললো, হ্যা, একটু টায়ার্ড। বলে শুয়ে পড়লো।

আমিও শুয়ে ভাবতে লাগলাম। এটা কি হলো। আমার ভাগ্যে কি জুটলো! একে নিয়ে কি করবো। এভাবে পাচ ছয় দিন কেটে গেল। বন্ধু–বান্ধবদের কিছু বলতে পারছি না। কেন যেন তাদের প্রতি আস্থা আনতে পারছি না। তাদের পরামর্শ নিতে ভয় হচ্ছে। না জানি কি পরামর্শ দেয়। তাতে হয়তো আরো জটিলতা সৃষ্টি হবে।

আরো কয়েকদিন গেল। স্ত্রী একদিন বললো, তোমাকে দেখে খুব মনমরা মনে হচ্ছে।

বললাম, আচ্ছা, তোমার কি কোনো অসুখ আছে?

হ্যা। মেয়েদের সাধারণত যেসব অসুখ হয় সেগুলো।

ডাক্তার দেখাওনি?

হ্যা, ওষুধ খাচ্ছি, কিন্তু ভালো হচ্ছে না।

কোন ডাক্তারকে দেখাচ্ছো?

একজন নাম করা ডাক্তারের কথা বললো। চিন্তা করতে লাগলাম কি করি। একবার ভাবলাম, দূর তাকে তার বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেই। যা হয় হোক। আমার ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো, সে এখন তোমার স্ত্রী। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তাকে বিয়ে করেছো। সমস্ত দায়দায়িত্ব এখন তোমার। আমার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। তাহলে কি করা যায়? সেটা যে হচ্ছে না তা তার অসুখের জন্য এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

চিন্তা করলাম চিকিৎসা পদ্ধতি বদলাতে হবে। তখনি মনে হলো, এক হেকিমের কথা। পার্শ্ববর্তী জেলাতে থাকে। সেখানে এক সময় কাজ উপলক্ষে বেশ কয়েক বছর ছিলাম। সে সময় আমার একটা অসুখ হয়, সেটা বাত। অ্যালোপাথি চিকিৎসা করছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের কথাতে বুঝতে পারলাম, এ ওষুধ জীবনভর ব্যবহার করতে হবে। বুঝলাম আমার অসুখ সারছে না, শুধু দাবিয়ে রাখছে। ওষুধ বন্ধ করে দিলাম। এর দিনকয়েক পর থেকে আবার ব্যথায় অস্থির হয়ে গেলাম। খোদার কাছে কামনা করতে লাগলাম, খোদা, তুমি অসুখ দিয়েছো, নিশ্চয় তার জন্য ওষুধ দিয়েছে। সেই ওষুধের সন্ধান দাও।

পরিচিত একজন দেখা করতে এলো এবং বললো, এখানে এক হেকিম আছে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারেন।

যেই কথা সেই কাজ। গেলাম হেকিমের কাছে। দেখলাম হেকিম এবং তার রোগীদের। তারা গরিব শ্রেণীর মানুষ। আমার উৎসাহে যেন একটু ভাটা পড়লো।

তিনি আমাকে ডাকলেন। আমার অবস্থা বলতে গেলাম। হেকিম হাত ইশারা করে আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমার হাতের কবজি ধরে নাড়ি দেখলেন মিনিট দুই মতো। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বলতে লাগলেন আমার কখন কি রকম হয়। তারপর বললেন, আপনার আর কিছু বলার থাকলে এখন বলেন।

বললাম, আমার আর কিছু বলার নেই। আপনি ওষুধ দেন। পনেরো দিন ওষুধ খাওয়ার পর রোগ ভালো হয়ে গেছে। মনস্থ করলাম স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাবো। তাকে বললাম, চলো, তোমাকে এক হেকিমের কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠলাম। হেকিমকে সেখানে আনলাম।

তার পদ্ধতিতে দেখলেন। ওনার বলার ভঙ্গী দেখে মনে হয় তিনি যেন আলট্রাসনোগ্রামের মতো মানুষের ভেতরটা দেখতে পান। ওষুধ দিলেন। বললেন, পনেরো দিনের ওষুধ দিলাম। আল্লাহর রহমতে এতেই ভালো হয়ে যাবে এবং সন্তান ধারণ করবে। দরকার হলে শুধু আপনি আসবেন। আমার এই মাকে আনার প্রয়োজন নেই।

ফিরে এসে ওষুধ খাওয়ানো শুরু করালাম। তার স্বাস্থ্য অনেক ভালো হলো এবং মাস খানেকের মধ্যে সন্তান ধারণ করলো। একটা সুস্থ সুন্দর কন্যা সন্তান উপহার দিল। যে ভালোবাসা স্ত্রীকে পুরোপুরি দিতে পারিনি সেটা আমার কন্যাকে উজাড় করে দিলাম। মেয়ের বয়স যখন আট মাস তখন তার মা অসুস্থ হলো। ডাক্তার দেখানো হলো, তিনি হাসপাতালে ভর্তি করতে বললেন। সেখানে ভালো চিকিৎসা পেলাম না। ডাক্তারকে বললাম, তিনি আবার মিশন হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন।

তাই করলাম এবং তারা সেদিনই জরুরি অপারেশনের ব্যবস্থা করলেন। শুধু ইংরেজ মহিলা ডাক্তার আমাকে ডেকে বললেন, আপনার ছেলেমেয়ে কয়টি?

বললাম, একটি মেয়ে। তিনি বললেন, ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক রাখার চেষ্টা করবো।

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন বেলা দুইটায় অপারেশন শুরু হয়েছে। বারান্দায় দাড়িয়ে আছি। খোদাকে বলছি, হে খোদা! আমার ছোট্ট সুন্দর মেয়েটাকে মাতৃহারা করো না। এভাবে খোদাকে ডাকছি। এদিকে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমার ভেতরেও ঝড় চলছে। একজন ডাক্তার তার চেম্বারে আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ডাক্তারকে বললাম এখন যে রোগীর অপারেশন চলছে সেটা আমার রোগী।

ডাক্তার বললেন, জানি। আজ কোনো অপারেশনের ডেট নয়। তবুও আধঘণ্টা আগে আমাদের সমস্ত স্টাফ গির্জায় গিয়ে এই রোগীর জন্য আলাদাভাবে প্রার্থনা করে এসেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, কি অসুখ হয়েছে?

তিনি বললেন, ফ্যালোপিন টিউবের অপারেশন হচ্ছে।

অপারেশনের পর ডাক্তার তার চেম্বারে ডেকে পাঠালেন। বললেন, রোগী ভালো আছে। আপনি আবার সন্তান নিতে পারেন। তবে চার বছরের আগে যেন সেটা না হয়।

তার উপদেশ মনে রাখলাম। চার বছর পর আর একটা সন্তান পেলাম সেটা ছেলে। সেই হাসপাতালে এবং সেই ডাক্তারের অধীনেই হলো। আবার ডাক্তার উপদেশ দিলেন, আর কোনো সন্তান নেয়া ঠিক হবে না।

কি করতে হবে? বললেন, লাইগেশন করে নেন।

সেটাও হয়ে গেল। এরপর ছাব্বিশ বছরে আরো তিনটা অপারেশন হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে – টিউমার, গলব্লাডার এবং শেষটা আবার টিউমার।

এতোগুলো অপারেশন করতে গিয়ে দায়িত্ব থেকে সরে যাইনি। এখনো অসুখে ভুগছে। তার সেবা করে যাচ্ছি ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে যেন তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। জানি না এটা ভালোবাসা, না দায়িত্ব বোধ।

কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

মানুষ মানুষের জন্য

– মোহাম্মদ হারুন-অর-রশিদ

আমার আট বছরের মেয়ে ফারিহা। তার মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করছে। বিষয়, কাজের বুয়ার মেয়ে যে দোকান থেকে প্যান্ট বানিয়েছে, তাকেও সেই দোকান থেকে প্যান্ট বানিয়ে দেয়া হয়েছে। ওই প্যান্ট পরবে না।

তার মা গলার স্বর উচু করে বলছে, দেখো মেয়ে, তুমি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করছো। বুয়ার মেয়ে যে দোকান থেকে প্যান্ট বানিয়েছে সে দোকানের প্যান্ট তুমি পরতে পারবে না, তুমি কি নবাব হয়ে গেছো? এভাবে কিছু সময় বলার পর থামলো। তারপর গলার স্বর নিচু করে ফারিহার মা ফারিহাকে বলতে লাগলো, দেখো মা, তারাও মানুষ, তুমিও মানুষ। তোমার যা যা আছে হাত, পা, মাথা, নাক, চোখ, বুক, পিঠ, ক্ষিধে, তৃষ্ণা ইত্যাদি তারও তা আছে।

তোমার আর বুয়ার মেয়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নেই। শুধু তোমার বাবা-মা তোমাকে একটা বিল্ডিংয়ে রাখতে পারছে। তোমাকে একটা ভালো স্কুলে পড়াতে পারছে। তোমার কিছু কিছু শখ মেটাতে পারছে। ক্ষিধে, তৃষ্ণা তোমাকে স্পর্শ করে না।

বুয়ার ছেলেমেয়েরা বিল্ডিংয়ে থাকতে পারে না, বস্তিতে থাকে। স্কুল তাদের ভাগ্যে জোটে না। ক্ষিধে, তৃষ্ণা, রোগ-ব্যাধি তাদের নিত্যসঙ্গী। বুয়ার ছেলেমেয়েরা ভীষণ কষ্টে থাকে। তাদেরকে কেন তুমি অবহেলা করবে? তাদেরকে কেন তুমি ঘৃণা করবে?

অতোগুলো কথার পর ফারিহা চুপচাপ হয়ে গেল। আমার মেয়ের এই মানসিকতায় আমি শংকিত। আমি ভীষণভাবে শংকিত। আমরা অভিভাবকরা হয়তো ছেলেমেয়েদেরকে যান্ত্রিক এই যুগে মানবিক গুণাবলীগুলো শেখাতে পারছি না।

আমার মেয়েকে কাছে টেনে আদর করে বললাম, মা মানুষকে কখনো ঘৃণা করো না, পারলে মানুষকে ভালোবেসো, ভালোবাসার চেয়ে ভালো জিনিস পৃথিবীতে খুব কমই আছে। আট বছরের এই ছোট মেয়েটি আমার কথা কতোটুকু বুঝলো জানি না। আমি চেষ্টা করছি, আমার মেয়ের এই মানসিকতা পরিবর্তনের। জানি না কতোটুকু পারবো। আমি বিশ্বাস করি মানুষকে ভালোবাসা এবং প্রাকৃতিকে। আমার এই বিশ্বাসে যদি তার পরিবর্তন হয়।

খুলনা থেকে

নিষ্ঠুর

– রোকসানা নাসরীন শিশির

বাবা সব সময় চাইতেন এমএসসি শেষ করার পরই আমি যেন আমার প্রিয় বন্ধুকে বিয়ে করি। আমিও এ চাওয়াকে মাথায় রেখেই পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের বন্ধুত্বকে আরেক বন্ধনে জড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার বন্ধুর পরিবারের লোকেরা লোভী প্রকৃতির। বন্ধুটিও এর বাইরে ছিল না।

সে সব সময় আমাকে ভয় দেখানোর জন্য বলতো, বিয়ে করে ফেলবো।

আমি ওর কথা কানে তুলতাম না। কেননা আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক দিনের। তাছাড়া সে আমাকে কথা দিয়েছিল আমাকেই বিয়ে করবে।

আমি অনার্স পাস করে এমএসসি–তে ভর্তি হয়েছি। এমন সময় একদিন খবর পেলাম, ওর লোভী বোনের শর্ত মেনে প্রায় দুই লাখ টাকা যৌতুক নিয়ে গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমার সামনে এসে একবার কথা বলার প্রয়োজনটুকু বোধ করেনি। এমন একটা নীচু ছেলের কথা মনে হতে নিজেকে অসহায় মতো হতো। কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতাম না। বাবা–মায়ের সান্ত্বনা পেয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে শক্ত করলাম। আবার লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে ফাইনাল পরীক্ষা দিলাম। সময় মতো রেজাল্ট বের হলো, সেকেন্ড ক্লাস পেলাম। এখানে একটা স্কুলে কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। অনেক কষ্টে ভালোবাসাহীন দেড়টা বছর পার করলাম।

বাবা আমার বিয়ের জন্য ছেলে নিয়ে আসেন। কিন্তু বন্ধুটি ও তার ভাই নানান বাজে কথা বলে বিয়ে ভেঙে দেয়। আমাদের পরিবার একটা হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলো। আর আমার অবস্থা শুধু আমি জানি। সব সময় ভাবি, এতো ভালোবাসতাম ছেলেটাকে। অথচ সে সংসার করছে। তা সত্ত্বেও আমার প্রতি তার বিকৃত আচরণ কেন? তখনো জানতাম না, এর চেয়েও করুণ দিন আমার সামনে আছে।

হীরা খুজলে অবশ্যই পাওয়া যায় এ কথায় বিশ্বাসী আমার বাবা বিয়ের জন্য ঘর আনতেই থাকলেন। অবশেষে একটা ভালো ছেলের সঙ্গে ১৫ মার্চ ২০০২–এ আমার বিয়ে হলো। সুখেই ছিলাম দুজন। আমাদের সংসারের বয়স পাচ মাস হলো। এর মাঝেই বুঝলাম আমার ভেতরে নতুন কেউ সাড়া দিচ্ছে। আনন্দ আর আনন্দ ছিল আমাদের চারদিকে।

কিন্তু আমার এই আনন্দ কারো সহ্য হবে কেন? সেই পুরনো বন্ধু বিভিন্নভাবে আমার স্বামীকে আকৃষ্ট করে তার সঙ্গে দেখা করতো। বিভিন্ন কথা বলতো যা আমি পরে জেনেছি। এক পর্যায়ে আমার স্বামী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে জীবন দিয়ে দিলেন। আমার পক্ষে এতো বড় কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না। এতো বেশি আঘাত পেয়েছিলাম যে, আমার বাচ্চাটাও পেটের মধ্যে মরে গেল।

দুনিয়াতে এখন আমি একা। আমার স্বামী, আমার বাচ্চা কাউকেই ওরা বাচতে দিল না। ওর প্রতিহিংসার আগুন আমার সংসারকে জ্বালিয়ে দিল। মানুষের মধ্যে ভালোবাসার পাশাপাশি সে এতো নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে থাকে তা আমি জানতাম না। আমি এতো অসহায় এটা জেনেও ওর বোন

এখনো আমার নামে খারাপ কথা বলে বেড়ায়। আসলে আমার সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল ওই রকম একটা নীচু পরিবারের ছেলেকে বিশ্বাস করে ভালোবেসে ছিলাম। আল্লাহ আমাকে মাফ করো।

ধানমন্ডি, জয়পুরহাট থেকে

অপমৃত্যু

– মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ

১৯৯৫ সালের প্রথম যখন ক্লাস এইটে নানার বাড়ির পাশের স্কুলে ভর্তি হলাম তখন নতুন পরিবেশেই আমার প্রয়োজন ছিল একজন ভালো মেধাবী বন্ধু যে আমাকে বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য করবে। পলাশ নামের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুকে পেলাম যাকে নিয়েই আজ আমার এই লেখা।

পলাশের সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই আমার খুব ভালো হৃদ্যতা হয়ে গেল। বাড়ন্ত বয়স। মেয়েদের দিকে একটু জড়াতে কার না মন চায়। তাই আমাদেরও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। দুজনের মন এক করে আমিই ঠিক করলাম পলাশের জন্য একটি মেয়ে। একই ক্লাসের প্রথম রোলধারী ছাত্রী সে। খুব সুন্দরী এবং মেধাবী। পরে জানলাম অনেক আগে থেকেই পলাশ তাকে মনে মনে ভালোবেসে আসছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস সে পায়নি। সুতরাং কাজটা আমিই করে ফেললাম। পলাশের ভালোবাসার কথাটা তাকে জানালাম।

সেও ছিল ছোট, আমরাও ছিলাম ছোট ছোট। জীবনের প্রথম প্রস্তাব শুনে ভীষণ লজ্জা পেল সে। আমাদের কাছ থেকে এক দিনের সময় চেয়ে নিয়েছিল। আমরা ভাবছিলাম তার কাছ থেকে না উত্তরই আসবে। কারণ সে ছিল একটু ভীতু ধরনের তবে দুরন্ত। সেই মেয়েটি যার নাম ছিল শিখা।

পরদিন শিখার উত্তর শোনার জন্য রাতে আমার ঘুম এলেও পলাশের ঠিক মতো ঘুম আসেনি। তাকে দেখে বুঝলাম সামান্য এক রাতের অপেক্ষা মনে হয় তার কাছে একশ বছরের মতো।

পরের দিন শিখার কাছ থেকে ছোট্ট একটা চিরকুট পেলাম যাদে শুধু লেখা ছিল *হ্যাঁ* শব্দটি। চিরকুটটি পেয়ে পলাশ যে কতো খুশি হয়েছিল তা বোঝাতে পারবো না। সে একবার চিৎকার করে বলছিল, পৃথিবীতে আমিই সবচেয়ে ভাগ্যবান।

তার সেই কথাটা আমাকে আজও কাদায়। এভাবে ভালোবাসাবাসির মধ্যে দিয়ে কেটে গেল দুই বছর।

১৯৯৭–৯৮ সালে সবাই এসএসসি পাস করলাম। ভর্তি হলাম সবাই একই কলেজে। আর এখানেই ঘটে গেল জীবনে হৃদয়বিদারক সেই লোমহর্ষক কাহিনীগুলো। তাদের পরস্পরের ভালোবাসা এতোই গভীর ছিল যে সেটা কল্পনাতীত। তারা একে অপরের এতো গাঢ়ভাবে আকড়ে ধরবে সেটা আগে ভাবিনি। তাদের প্রেমের চিঠিগুলোতে প্রায়ই দেখতাম আঙুলের কাটা দাগসহ রক্তের ছাপ। কলেজ চলাকালে কখনো দেখিনি তাদের একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন সামান্য পানিও খেতে। যা খেতো এক সঙ্গেই খেতো।

পলাশ এবং আমি একই মেসে থাকতাম। খেয়াল করেছি, পলাশের সমস্ত কাজেই ছিল শিখাকেন্দ্রিক। শিখা কোনটা পছন্দ করবে, না করবে সেদিকেই অগ্রসর হতো। শিখার জন্য সে

ধূমপান ছেড়েছে, সিনেমা দেখা ছেড়েছে, অন্য মেয়েদের দিকে তাকানো বাদ দিয়েছে। কিন্তু কে জানতো তাদের এতো বেশি মেলামেশা সহ্য হবে না?

শিখা একদিন আমাকে বলেছিল, দেখো আসাদ, আমার কাছে পলাশ ভালোবেসে পারবে না। আমি কখনো হারতে শিখিনি।

শিখার এবং পলাশের পারিবারিক দিক ছিল মোটামুটি সচ্ছল। ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে একে একে উভয় পরিবারের সবাই তাদের সম্পর্কের কথা জেনে গেল। শিখাদের পরিবারের কেউই পলাশকে মেনে নিতে রাজি নয়। তেমনি পলাশের পরিবারও। উভয় পরিবারের চাপটা আমার ওপরই আসতে লাগলো একটু বেশি। সামনে এইচএসসি পরীক্ষা। তারপরও এই সমস্যা। বরাবরের মতোই আমার কাছে তারা সমস্যা সমাধানের উপায় চাইলো। দ্বিধা সংকোচহীনভাবে বললাম, আজই বিয়ে করে ফেল তোরা।

পলাশ বললো, বিয়েটা ছিনিমিনি খেলা না যে, বললাম আর হুট করে হয়ে গেল।

এখানেই হলো জীবনের চরম ভুল। ২০০০ সালের ১৫ এপ্রিল পরীক্ষা শুরু হবে। দুই দিন আগে এডমিট কার্ড তুলতে এসে সাক্ষাৎটা ছিল তাদের জীবনের শেষ সাক্ষাৎ। ওই দিনই সিদ্ধান্তে এলাম পরীক্ষার পরে তারা বিয়ে করে ফেলবে।

কোনো এক মাধ্যম দ্বারা সেই সিদ্ধান্তের কথাটা শিখার আব্বার কানে গিয়ে পৌছালো। রসায়ন পরীক্ষার দিন দেখলাম শিখা অনুপস্থিত। পলাশ ভীষণ অস্থির হলো, তাকে বোঝালাম। হঠাৎ তার মতো মেধাবী ছাত্রীকে পরীক্ষা না দিতে দেখে স্যারসহ সকলের মনে কৌতূহল হলো।

পলাশ আধা ঘন্টার বেশি সময় পরীক্ষার হলে থাকতে পারলো না। বাথরুমে যাওয়ার নাম করে আমার পাশ দিয়ে চলে গেল আর ফিরে আসেনি। পরীক্ষা শেষে পলাশের বাবা পলাশের খবর জানতে চাইলে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। খবর পেলাম পলাশ হাসপাতালে।

পরে জানলাম শিখার খোজে সে শিখাদের বাড়ি গিয়েছিল। তখন শিখার ভাইয়েরা এবং চাচারা তাকে মেরে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ভাবলাম পরীক্ষা দেবো না। তবে পলাশের কসমে আমার পরীক্ষাগুলো দিতে হলো। পলাশের বাবা থানায় পুরো বিষয়টা জানালেন। এবং পলাশের ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়ায় তাকে ঢাকায় নিয়ে এলেন।

এর মধ্যে শিখার কোনো খবর নিতে পারিনি। খুব কষ্ট করে শুধু শুনেছিলাম তাকে ঘরের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে এবং শিখার বিয়ে ঠিক করেছে।

দীর্ঘ এক মাস এগারো দিন পরে পলাশ ফিরলো শিখার বিয়ে হওয়ার ঠিক তিন দিন আগে। এক মাত্র ছেলে হিসেবে পলাশের মা পলাশকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন মাথায় হাত দিয়ে যে, শিখার বিয়েতে সে কোনো অসুবিধা করবে না। বুকফাটা আর্তনাদ আর বোবা কান্নাগুলো চেপে রেখে ভালোবাসার কাছে নতিস্বীকার করলো এই প্রথম পলাশ। সে আমাকে বলেছিল, বুকের ভেতরে আমার রক্তক্ষরণ হয়ে যাচ্ছে, হয়তো বেশি দিন বাচবো না।

শিখা কেমন আছে, কিভাবে আছে তার খবরগুলো জানতে পলাশের প্রতিটা শিরা-উপশিরা পর্যন্ত কেঁদেছে। তার প্রতিটা রক্তকণা যেন বলছে শিখা, শিখা। তাকে খুব ভালো করে বোঝালাম। মুখে মুখে সে বুঝলেও মনে সে বোঝেনি সেটা জানতাম।

শিখার বিয়ের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমরা এক জায়গাতেই ছিলাম। শুনলাম পলাশের প্রলাপ। তার চোখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারিনি। চোখ দুটি ছিল ভীষণ লাল। সেই এইট থেকে ঘটে যাওয়া এই পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাগুলো সে একের পর এক বলতে লাগলো।

এভাবে দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা। সারাদিন কিছুই খায়নি সে। বিকেলে সে একবার আমাকে বলেছিল আচ্ছা, শিখা কি আমার কথা একবারও ভাবছে না।

আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি। ধরা বিয়ে বিধায় শিখাকে বিয়ে করেই তাদের নিজের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে।

রাত প্রায় তিনটা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল কারো কান্নার শব্দে। দেখলাম পাশে পলাশ নেই। তাকে পেলাম বাইরে খোলা আকাশের নিচে বসে থাকতে। অবাক হলাম, যে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভয় করতো অন্ধকারকে সেই অন্ধকারে বসে আছে একা একা কান্নারত অবস্থায়।

বাকি রাতটুকু আর ঘুমানো হয়নি। যতোই ভোর হচ্ছে ততোই অচেনা এক অস্থিরতা পলাশকে যেন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার বুকটা যেন হাহাকার হচ্ছে।

ভোরবেলায় ঘরের বাইরে থেকে আসা একটা আওয়াজ আমার এবং পলাশের হৃদয়টা ভেঙে ছারখার করে দিল। শিখা আত্মহত্যা করেছে। পলাশ আমার দিকে তাকিয়ে বাইরে আসার চেষ্টা করলো। আমি, তার বাবা, মা সবাই জোর করে ধরে রাখলাম। তাকে কতোক্ষণ ধরে রাখা যাবে? বাকরুদ্ধ পলাশ এবং আমার নামে কেস হলো। পলাশ শুধু একবার তাকে একটু দেখতে চাইলো, তার কবরে একটু মাটি দিতে চাইলো ঠিক যেন পাগলের মতো হয়ে। শিখার বাবা, মা তার ওই আবদারটুকুও রাখলেন না।

ঠিক পরের দিন ওই একই সময়ে যখন শিখা মরছিল, পলাশও চিরবিদায় নিল এই পৃথিবী ছেড়ে। সেও আত্মহত্যা করেছে। ২০০০ সালের ৫ জুন এবং ৬ জুন বিদায় হলো ভালোবাসার দুই কিশোর–কিশোরী।

৮ জুন *দৈনিক পূর্বাঞ্চল* এবং *জনকণ্ঠ* পত্রিকা প্রকাশ করলো তাদের অপমৃত্যুর কথা। আমি তখন কারাগারে বন্দী।

সুলতানপুর, সাতক্ষীরা থেকে

প্রেয়সী

– এম.ইউ.ইসলাম

আমি যে চেয়ারটিতে বসে চিঠিখানা লিখছি এবং আমার সামনের টেবিলটি নানাবাড়ির ঐতিহ্য বহন করছে। এ দুটির সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে, অনেক ঘটনার সাক্ষী এ দুটি। এই চেয়ার এবং টেবিলটির বয়স এখন একশ বিশ বছর।

আজ থেকে একশ বছর আগে ১৯০৩ সালে আমার আম্মার নানা এই টেবিলে বসে একখানা চিঠি লিখেছিলেন তার প্রিয়তমার কাছে। তার প্রিয়তমা ছিলেন তারই দূরসম্পর্কের এক খালাতো বোন। চিঠিটা ছিল তার কলকাতা জিপিওতে চাকরি পাওয়ার সুখবর বিষয়ে। ভদ্রলোকের নাম সৈয়দ আফতাব আলী। শুনেছি তিনি নাকি খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন।

কলকাতা পৌছানোর কয়েকদিন পর তিনি তার প্রেয়সীর কাছ থেকে রিপ্লাই পেলেন। ভীষণ আবেগে লেখা সেই চিঠিটি ছিল নিজ শরীরের রক্ত দিয়ে। লেখার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন অনেক কিছু। পারিবারিক পর্দা প্রথার কারণে আমার প্রমাতাসহ পত্রটি পাঠিয়েছিলেন লোক মারফত আর তার প্রেয়সীও উত্তর লিখেছিলেন ওই লোকটির মারফতে। কারণ ডাকযোগে চিঠি পাঠালে পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যের হাতে পড়বেই। তাদের পরিণয় হয়েছিল অবশ্য পারিবারিক সমঝোতায় সম্মানজনকভাবে।

কিছুদিনের মধ্যে তাদের ঘর আলো করে এলো দুটি সন্তান। আমার নানি ও তার এক ভাই বেশ আনন্দে তাদের দিন কাটছিল। এভাবে পঞ্চম বছরে আমার বুড়িমা (আম্মার নানি) কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহজগৎ ত্যাগ করলেন। বুড়ো আব্বা (আম্মার নানা) ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন। অবুঝ শিশু সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় দ্বিতীয় বিয়ে করলেন বটে। তবে প্রথম স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন রাখলেন তার সমাধিতে শ্বেত পাথরের একটি এপিটাফ স্থাপন করে। এই এপিটাফটি ছিল তিন ফিট গুণ তিন ফিট সাইজের শ্বেতপাথর। এই এপিটাফের কারুকার্য ও লেখার কাজটি সৈয়দ আফতাব আলী নিজেই করেছিলেন এ টেবিলে বসেই।

তিনি যে একজন নিখুত শিল্পী ছিলেন এ কথা হলফ করে বলতে পারবো। কারণ তিনি যে এ কাজ কতো দরদ দিয়ে করেছেন তা না দেখলে বলা সম্ভব নয়। কর্মনিপুণতায় তার আন্তরিকার ছাপ রয়েছে। তার একটি কলের গান ছিল যা আজও সচল। আমার নানি তার বাবা মায়ের স্মৃতিকে ধরে রেখেছেন পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। প্রতিদিন এ টেবিলে বসেই তিনি পত্রিকা পড়েন, কোরআন পড়েন এবং নিজ হাতে মুছে রাখেন সব কিছু।

আটাশ বছরের এক শিক্ষিত বেকার যুবক বসে ভাবছি, আমার ভালোবাসাকে নিজের মধ্যে আর কতোকাল এভাবে কষ্ট যন্ত্রণায় রাখতে হবে। আমার জীবনে কি এমন ক্ষণ আসবে না যখন এ টেবিলে বসেই একটা সম্মানজনক চাকরির সুসংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখবো আমার প্রেয়সীর কাছে? ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে উঠলাম এমন সময় পাশে থাকা কলের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বেজে উঠলো –

ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে... ।

সোনাডাঙ্গা, খুলনা থেকে

লাচ্ছা সেমাই

– হাসান হাবিবুর রহমান

ঈদের ছুটি শেষ। মাকে বললাম, আগামীকাল রাজশাহী যাবো।

পরদিন ভোরে মা একটু লাচ্ছা সেমাই, পায়েস রান্না করলেন। তারপর সকালের খাওয়া সেরে মাকে সালাম জানিয়ে ব্যাগটা নিয়ে বের হলাম আব্বার সঙ্গে। স্টপেজে অপেক্ষা করছিলাম বাস আসতে দেরি করছিল বলে। হঠাৎ চাদর গায়ে সাইকেল নিয়ে ভাইয়া হাজির। এগিয়ে যেতেই চাদরের মধ্য

থেকে ছোট একটা বাটি আর শার্টের পকেট থেকে চামচ বের করে বললেন, বাস আসার আগেই কোনো দোকানে গিয়ে খেয়ে নে।
মনে পড়লো ভোরের রান্নার কথা। নিশ্চিত হলাম, মা ভুলে গিয়েছিলেন এখন মনে পড়েছে। তাই ভাইয়ার এই হঠাৎ আগমন। পাশের পরিচিত দোকানে গিয়ে শেষ করলাম খাবারটুকু। একটু পরেই বাস এলো। আব্বুকে বলে উঠে পড়লাম। সিটে বসে ভাবলাম এই হলো মা আর তার ভালোবাসার প্রকাশ।
হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে, মা।

রাজশাহী থেকে

অবিশ্বাস

– নিলয়

ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসই যদি না থাকে তাহলে ভালোবাসা হয় মূল্যহীন। সামান্যতম অবিশ্বাস অপূরণীয় সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। ভালোবাসার প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ করে আমার কি ক্ষতি হয়েছিল তা যাযাদির মাধ্যমে তুলে ধরছি।
আমার ভালোবাসার নাম আকাশ। অতি সাধারণ এক ছেলে। দেখতে মোটেও সুন্দর নয়। তবুও তাকে ভালোবেসেছি আকাশের মতো তার উদারতা দেখে। আকাশের মতো সুন্দর একটা মন আর বিশাল একটা হৃদয় আছে তার। তার কোনো কিছুই আমার কাছে সে গোপন করতো না। আমার এগুলোকে মিথ্যা মনে হতো। প্রায় প্রতিদিন দেখা করতাম আমরা। মাঝে আমার পরীক্ষার জন্য তাকে দেখা করতে নিষেধ করেছিলাম। বেচারার হাতে অফুরন্ত সময়, করার কিছু ছিল না। তাই সে দিনের বেশির ভাগ সময়ই ইন্টারনটে চ্যাট করতো। এভাবে তার কয়েকজন বৈদেশিক বন্ধু হয়ে যায়, তাদের সঙ্গে সে ই-মেইলে যোগাযোগ করতো।
পরীক্ষার ফাকে একদিন তার মেইল খুলে দুটো মেয়ের মেইল দেখি। সে আমাকে আগেই বলেছিল যে, তার বাইরের কিছু মেয়ে বান্ধবী আছে এবং যাদের সঙ্গে তার ই-মেইলে যোগাযোগ হয়। সে আমাকে এতোই বিশ্বাস করতো যে, আমাকে তার মেইলের পাসওয়ার্ড দিয়েছিল। ওই মেইলগুলো দেখে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। যদিও দুঃখ পাবার কোনো কারণ ছিল না। যদি সে এগুলো আমার কাছে গোপন রাখতো তাহলে তার ওপর আমার রাগ হতো। কিন্তু আমার কাছে আমার আকাশ এতোই স্বচ্ছ ছিল যে, সে কোনো কিছুই গোপন রাখেনি। তবুও তাকে অবিশ্বাস করতে শুরু করি। এ জন্য তাকে চরিত্রহীন বলেছিলাম।
আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই তার একটা চাকরি হয়ে যায়। এবার তার ব্যস্ততা আর আমার অফুরন্ত সময়। এ সময়টাতে ধুমসে চ্যাট করতে লাগলাম। বেশ মজাই লাগতো তা করতে। প্রতিদিন নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয়। এদের সঙ্গে মেইল দেয়া-নেয়া করতে বেশ ভালো লাগতো। আকাশ মেইল করতো বলে তার ওপর রাগ করেছিলাম। সেটাই এখন করছি। এটা জানতে পারলে সে যদি রাগ করে এ জন্য তাকে কিছুই জানাইনি। এমনকি সে আমার ই-মেইল অ্যাড্রেসও জানে না। এবং এটা করার জন্য আমার কোনো রকম লাগেনি। মেইলের মাধ্যামে আমার ছবিও পাঠিয়েছিলাম।

এদের মধ্যে ইনডিয়ার একটা ছেলে হঠাৎ একদিন আমার ফোন নাম্বার চাইলে কেন যেন তা দিয়ে দিই। আমাকে অবাক করে দিয়ে ছেলেটা আমাকে একদিন ফোন করে। কথা বলতে বলতে বললো। সে বাংলাদেশে আসছে।

ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ থৃলিং মনে হয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন শুধু আমার জন্য বাংলাদেশে আসবে ব্যাপারটা ভাবতেই বেশ ভালো লাগছিল।

আমি যে এতোদূর চলে গিয়েছিলাম তা আকাশ ধারণাও করতে পারেনি। সে প্রতিদিন সকালে অফিসে পৌছেই আমাকে ফোন করতো। দায়সারাভাবে তার সঙ্গে কথা শেষ করতাম। অথচ আমার মন পড়ে থাকতো ওই ইনডিয়ান ছেলেটা অমিত কবে আসবে? শুধু আকাশ কেন, আমার মা-বাবাও জানতেন না আমার এ মিশন। একদিন আকাশকে বললাম যে, আমি এক সপ্তাহের জন্য ঢাকার বাইরে যাচ্ছি।

আসলে এটা ছিল একটা চালাকি। যেন নির্বিঘ্নে অমিতের সঙ্গে দেখা করতে পারি। বোকা ছেলেটা আমার কথা এতোই বিশ্বাস করে যে, সে মনে করেছিল সত্যি সত্যিই আমি ঢাকার বাইরে যাচ্ছি।

অনেক প্রতীক্ষার পর অমিত এলো। এসে আমাকে ফোন করে জানায় যে সে এসেছে। পরে একদিন দেখা করার কথা বলে। এমনিতেই তার সঙ্গে দেখা করতে উদগ্রীব ছিলাম। নির্দিষ্ট দিনে আমরা দেখা করলাম। সে একটা গাড়ি নিয়ে এলো। দেখলাম আমার ইনডিয়ান বন্ধুকে। বেশ হ্যান্ডসাম দেখতে। মনে মনে আহত হলাম। কেন আমার আকাশ এমন হলো না অথবা কেন আরো আগে অমিতের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো না। গাড়িতে আমরা সারা ঢাকা ঘুরবো এটা বলেই সে আমাকে গাড়িতে তুলে নিল। মাঝপথে সে তার আরো দুই বন্ধুকে তুলে নিল। কিন্তু তখনো আমার জানা ছিল না সুন্দরের আড়ালে রয়েছে কুৎসিত একটা পশু।

এতোক্ষণ সে ড্রাইভ করছিল। পরে তার বন্ধু ড্রাইভ করছিল আর সে আমার পাশে পেছনের সিটে বসেছিল। এতোক্ষণ ভালোই ছিল। হঠাৎ সে আমার হাতটা ধরলো। আমি তো অবাক, অন্তত বলতে তো পারতো যে, তোমার হাতটা ধরি। অথচ আকাশ আমার হাত ধরতে সময় নিয়েছিল ছয় মাস। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয়। পরে জোর করে আমাকে শুইয়ে কাপড় খুলতে বাধ্য করে। বলে আমি যদি না খুলি তাহলে ছিড়ে ফেলবে। পরে সে আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ কেড়ে নিল। পরে অন্য দুইজনও তা করলো। চলন্ত গাড়িতে ব্যাপারটা ঘটলো। পশুটা যখন আমার ওপর উঠে পাশবিক আনন্দ উপভোগ করছিল তখন আল্লাহ আল্লাহ না বলে আকাশ আকাশ বলছিলাম। ওই মুহূর্তে আকাশ যদি রুখে দাড়াতো! ওই তিনটা ছেলে আমার আকাশের কাছে কিছু না। কারণ সে শুধু দুইটা স্টিক দিয়ে ড্রামেই তাল তুলতে পারে না, তায়াকোয়ান্ডোও জানে।

একরাশ ঘৃণা নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে অনেকবার গোসল করেও মনে শান্তি আসেনি। মনে মনে আকাশের কাছে লক্ষ কোটিবার ক্ষমা চেয়েছি। কিন্তু আকাশকে কিছু বলতে পারছি না। শুধু আকাশ কেন, কাউকেই বলতে পারছি না এ দুর্ঘটনা কথা, এ লজ্জার কথা। সহজভাবে আকাশের সঙ্গে মিশতে পারছি না। বেচারা ভাবে তার ওপর রাগ। একবার ভেবেছি আত্মহত্যা করবো। তবে আমি না থাকলে আকাশ বাচবে না। সব কিছু হারানোর পর তার ওপর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। এখন তার

প্রতিটি কথা বিশ্বাস করি। তাকে অবিশ্বাস করেছিলাম ঠিকই কিন্তু আমিই যে এখন অবিশ্বাসী। তাকে চরিত্রহীন বলতাম। সে এখন পর্যন্ত আমার হাত ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ আমি এ কি করলাম?

জানি না কবে আকাশের কাছে সহজ হতে পারবো। এ পচে যাওয়া শরীরটা নিয়ে কিভাবে তার সামনে দাড়াবো? তার ওই সরল চোখে তাকাতে পারি না। অথচ নিচের জীবনের চেয়ে সে আমাকে বেশি ভালোবাসে। এখন আর কোনো কিছু ভালো লাগে না। ঠিক মতো খেতে, ঘুমাতে পারি না। চ্যাটকে ঘৃণা করি। সব সময় নিজেকে তুচ্ছ, অবহেলিত, ঘৃণিত মনে হয়। মনে হয় আমিই আকাশকে ঠকিয়েছি। এখন আমি কি করবো?

ভালোবাসা দিবসে যাযাদির মাধ্যমে সব প্রেমিক-প্রেমিকাকে বলতে চাই, ভুলেও নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাসকে ঠাই দেবেন না। সামান্যতম সন্দেহ বা অবিশ্বাস আপনার চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

niloy143@yahoo.com

পাওনা

– এমদাদুল হক উজ্জ্বল

১৯৯৭ সাল। স্কুলে ক্লাস টেনে পড়তাম। আমাদের স্কুলের নাম ছিল সৈয়দ কুতুব জালাল হাই স্কুল। বাড়িতে সবার চোখে শান্ত স্বভাবের থাকলেও স্কুলে সবার চোকে ছিলাম খুব চঞ্চল। বিশেষ করে শিক্ষকদের চোখে। লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো ছিলাম।

যাই হোক। এবার আমার জীবনের যে ঘটনাটি লিখতে যাচ্ছি সেদিকে অগ্রসর হওয়া যাক। আমার জীবনের ঘটনার নায়িকা হলেন শম্পাআপা যিনি আমার বয়সে চার পাচ বছরের বড় হবেন। আমাদের বাড়ির পাশেই তাদের বাড়ি। রাস্তা দিয়ে যেতে হলে তাদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। তাদের বাড়ির পাশে আসতেই তিনি আমাকে ডাক দিলেন। তার ডাকে আমি গেলাম।

তিনি বললেন, এই স্বপন, তুই আমাকে একটি উপন্যাসের বই এনে দিবি।

এ কথা শুনেই আমার মাথায় একটি দুষ্টুমির খেলা এসে গেল। বললাম, হ্যা, দিতে পারি। আমার কাছে অনেকগুলো ভালো উপন্যাস আছে। তার মধ্যে একটি বই আছ যেটা পড়তে খুব মজা লাগে। আর বইয়ের ফটোগুলো খুব সুন্দর।

তাহলে ওই ভালো বইটা তুই আমাকে দিস।

বললাম, ঠিক আছে, বিকেলে নিয়ে আসবো। বলে বিদায় নিলাম। বাড়িতে এসে বিকেলে বইটি নিয়ে গেলাম আপাকে দেয়ার জন্য। আসলে বইটি ছিল সেক্সের বই যেটাতে ছিল অনেক সেক্সের গল্প এবং নগ্ন মেয়েদের ছবি।

যাহোক, বুকে সাহস নিয়ে আপাকে বইটি দেয়ার জন্য গেলাম। আপা হাতে নিলেন বইটি এবং পৃষ্ঠাগুলো উল্টোতে লাগলেন। তারপর বললেন, স্বপন, বইটি তো সুন্দর রে।

কথাটা শুনে আমি আর আপার মুখের দিকে তাকাইনি। রাগে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। এরপর বুঝলাম এ পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া কেউ কিছু করে না। আজ আপা এক সন্তানের জননী। কিন্তু আজ পর্যন্ত আপার সঙ্গে কথা বলিনি।

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট থেকে

জাদুকরের পাল্লায়

– ওয়ালি হাসান রিপন

সেই ১৯৮৮ সালের কথা। তখন পড়তাম জয়পুরহাটের খনজনপুর মিশন গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস টু–তে। আমাদের স্কুলটা আজব ধরনের। নাম গার্লস স্কুল হলেও ছেলেদের ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ানো হয়।

একদিন টিফিনের পর আমাদের স্কুলের মঞ্চে জাদু প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। মঞ্চের সামনের মাঠে ঘাসের ওপর আমরা বসেছি। পেছনে স্যার দিদিমণিরা। জাদুকর ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় নানান রকম জাদু দেখাচ্ছেন। প্রতিবারই একজন একজন করে মঞ্চে ডাকছেন, কিন্তু একবার একজন ছেলে ও মেয়েকে ডাকলেন। কিছুক্ষণ পর তারা লজ্জায় মঞ্চ থেকে নেমে এলো। বাধ্য হয়ে জাদুকর আমাদের মাঝে নেমে এসে ছেলের মধ্যে আমাকে এবং মেয়েদের মধ্যে আমারই এক সহপাঠিনীকে বাছাই করলেন। দুইজনকে মঞ্চে পাশাপাশি দাড় করিয়ে চাল চিনিতে রূপান্তরের জাদু দেখালেন এবং আমাদের হাতে দিয়ে খেতে বললেন। খেয়ে তো আমি অবাক। এরপর আরও অবাক হলাম যখন জাদুকর একে অপরকে খাওয়াতে বললেন। লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম, বলে কি! আমাদের সামনের সকলে আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করেছে।

জাদুকরের আদরমাখা কথায় সেদিন না করতে পারিনি। স্কুলের সকলের সামনে এমন কাণ্ড হবে জানলে কি আর মঞ্চে উঠতাম।

এরপর স্কুলের সকলে আমাদের দিকে বাকা নজরে তাকায়, এমনকি স্যার–দিদিমণিরা পর্যন্ত। বন্ধুরা তো সারাক্ষণ শুধু ওই ব্যাপারটায় নাড়াচাড়া করে। অবস্থা এমন হলো যে, তার দিকে লজ্জায় তাকাতেও পারছিলাম না, বাড়িতেও শান্তি পেতাম না। কেননা আমার মামাতো ভাইবোনরাও সেদিন স্কুলে উপস্থিত ছিল আর নানা বাড়িতেই আমি থাকতাম। বড়রা শুধু ঠাট্টা করতো এবং হাসতো। এভাবেই চলছিল।

একদিন আমার বন্ধুটি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কারণ তার বাবা বদলি হয়েছেন। সেদিন হাপ ছেড়ে বেচেছিলাম মনে হয়েছিল। তবে সে স্কুল থেকে বিদায় নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমার মন থেকে বিদায় নিতে পারেনি। আজও স্মৃতির অ্যালবামে তার স্থান চিরঅম্লান হয়ে আছে।

সেউজগাড়ি, বগুড়া থেকে

দ্বিচারিণী

আমি সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়েছি। কিন্তু এরই মধ্যে আমার জীবনে ঘটে গেছে এক জটিল ঘটনা। যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন পরিচয় হয় আকাশের সঙ্গে আমার একজন প্রিয় বান্ধবীর মাধ্যমে। তারপর থেকে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় আমার প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এর মূলে ছিল সে। আমাদের কিছু করার ছিল না।

যাহোক, এরপরও আমাদের সম্পর্কে কোনো চিড় ধরেনি কোনোদিন। আমিও তাকে পাগলের মতো ভালোবাসতাম। বয়সের তুলনায় আমার বিচার, বুদ্ধি ছিল কম। তাই সে আমাকে আরো বেশি ভালোবাসতো এবং আমাকে এমনভাবে রাখতো যেন মাটিতে রাখলে পিপড়ে না খায় আর মাথায় রাখলে উকুনে না খায়। ঠিক এমনি করেই চলছিল আমাদের সময়।

আমি আমার পরিবারের ছোট মেয়ে এবং সবার আদরের তো বটেই। যখন আমাদের ব্যাপারটা জানাজানি হলো তখন তো সবাই কি করবে তা বুঝতে পারছিল না। কারণ আমাকে কষ্ট দিয়ে তারা কিছু করবে না। আমার মা বুদ্ধিমতীর কাজ করলেন যাতে আমার পড়াশোনার কোনো ক্ষতি না হয় সে জন্য ব্যাপারটা মেনে নিলেন এবং বললেন মেনে নেয়াটা তখনই কার্যকর হবে যখন ছেলের যোগ্যতা থাকবে, ততোদিনে আমারও পড়াশোনা শেষ হবে। তখন আমরাই মতামত দিতে পারবো। আমরা দুইজনে তো মহাখুশি। এর বছর খানেক পর সে তার যোগ্যতা অর্জনের জন্য বিদেশ পাড়ি দিল অশ্রুর বন্যা ঝরিয়ে।

তারপর আমাদের ফোনে যোগাযোগ হতো প্রতি মাসে তিন চারবার আর চিঠিতো আছেই। এর মাঝে আমি দেশে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। আমার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু–বান্ধবী ছিল না। যারা ছিল তারা শুধু হাই–হ্যালোর মধ্যে। কিন্তু বেচে থাকার জন্য কারো না কারো সঙ্গে একটু হলেও দুঃখ শেয়ার করতে হয়। ফোন এবং চিঠিতে তো সব কথা হয় না। তারপরও আমাদের মধ্যে ভালোবাসা এতোটুকু পরিমাণ কমে যায়নি কখনো। তাছাড়া যে কথা কাউকে বলা যায় না সে কথা কেবল খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেই বলা যায়।

দীর্ঘ এক বছর পর একজন বন্ধু পেলাম, তাও তার সঙ্গে অনেক সময় নিয়ে বন্ধুত্ব হলো। আমার বন্ধুটির কথা আকাশকে জানিয়েছি। কিন্তু আকাশ সম্পর্কে বন্ধুটিকে জানানো হয়নি। কারণ আমার ধারণা ছিল যে, আকাশের সম্পর্কে জানে। আমাদের ছোট্ট শহরের প্রায় অধিকাংশ ছেলে মেয়েই আমাদের কথা জানতো। তাই আর আলাদাভাবে জানানোর প্রয়োজন মনে করিনি। তাছাড়া এসব বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে তেমন কথা বলতাম না।

চলছিল আমাদের বন্ধুত্ব ভালোই। কিন্তু কথায় বলে *যার বিয়ে তার খবর নেই পাড়া–পড়শির ঘুম নেই।* আমার বান্ধবীরা পর্যন্ত কানাঘুষা শুরু করেছে আমাদের দুইজনকে নিয়ে। সব কিছুই আমরা জানতাম। তারপরও আমাদের মতোই আমরা চলতাম। আমি কখনোই গুজবে বিশ্বাসী নই এবং বন্ধুর সঙ্গে প্রেম এটা ঘৃণা করতাম। কারণ বন্ধু হারানোর বেদনা হাড়ে হাড়ে জানি। একজন ভালো বন্ধু হারানো যে কতো কষ্টের তা একমাত্র আমিই জানি।

আমাকে আবারও দুঃখ পেতে হলো। কানাঘুষা শুনতে শুনতে আমাদের বন্ধুত্বটার ভিত্তি মজবুত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু আমার বন্ধুটি আমাকে ফিল করতো খুব বেশি এবং এক সময় না পেরে আমাকে প্রস্তাব দিয়েই ফেললো। এখন আমি পড়েছি মহাবিপাকে। না পারছি প্রাণের বন্ধুকে ছাড়তে, না পারছি হ্যা বলতে।

যখন আমি নিঃশব্দে এসব ভাবছি ঠিক তখনি সে আমার ঠোটে আলতো করে চুমু খেলো। আমি নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার মুখ থেকে কোনো কথা বের হয়নি।

এর কিছুদিন পর সমস্ত কিছু তাকে খুলে বললাম। সব শুনে সে ভড়কে যায়। কিন্তু পিছু হটেনি, বরং নতুন উদ্যমে নতুন করে সে তার প্রেমের তরী ভাসিয়ে দিয়েছিল জীবনের নদীতে। আমরা আজও ভেসে চলেছি। তবে সর্বদা উৎকণ্ঠা, ভয়। এসব ভাবনা আমাকে ঘিরে রাখে।

সেও আমাকে ভীষণ ভালোবাসে। একদিনের বেশি না দেখে থাকতে পারে না। আমার জন্য সে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করে। আমিও তাকে পছন্দ করি প্রচণ্ড রকমভাবে। ঠিক কোথায় যেন একটা টান অনুভব করি তার জন্য। আবার আকাশের জন্যও বিন্দুমাত্র ভালোবাসা কমেনি। এখানেই আমার জটিলতা। তারচেয়েও বেশি জটিলতা হলো আমার পরিবারের মানুষ আকাশকে দিন দিন আরো বেশি পছন্দ করছে। ছেলে হিসেবে দুজনেই ভালো। আমার বন্ধুটিকেও আমার পরিবার ভালোই জানে। তবে বন্ধু হিসেবে, ভালোবাসার মানুষ হিসেবে নয়।

এখন আমি সময়ের অপেক্ষায় দ্বিচারিণীর মতো দুই জায়গায়তে বিচরণ করছি। আমি যে আমার বন্ধুকে দূরে সরানোর চেষ্টা করিনি তা নয়। সে নাছোড়বান্দা। আমাকে সে ছাড়বে না এবং আমার সঙ্গে সে আঠার মতো লেগে থাকে। এর কি কোনো একটা সমাধান আছে? আমার ছোট্ট মাথায় অন্য কিছু ঢুকছে না।

নাম ও ঠিকানাবিহীন

একজন রুবিআপা

– রশিদ আহমেদ তালুকদার রাসেল

২০০০ সালের এপৃলের মাঝামাঝি। চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির চার পাশের বদ্ধ পাহাড়ের গুমোট বাতাসে দম বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা। কোথাও গিয়ে খানিক হাপ ছেড়ে বাচার মতো অবস্থাটা পর্যন্ত নেই। কারণ ক্লাস চলছিল পুরোদমে। এরই মধ্যে শহর থেকে রুবিআপা ফোন করলেন।

রুবিআপা ছোট খালার ভাসুরের মেয়ে। বছর তিনেক হয়েছে বিয়ে হয়েছে। স্বামী প্রবাসী। বিদেশে থাকেন। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এলাকার এক সুরম্য বাড়ির তিন তলায় তিনি থাকেন। তার সঙ্গে দুজন দেবর, ননদও থাকে। রুবিআপা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় হলেও আমরা বন্ধুর মতোই একে অন্যের প্রতি আচরণ করি। আচার-আচরণে বেশ স্মার্ট হলেও দেখদে শুনতে শাদামাটাই। তিনি আমাকে কেন জানি একটু বেশিই ভালো জানেন। তাই যখন-তখন হুট করেই সাধারণ কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান হলেই আমাকে না বলে ছাড়েন না। আমিও তার ডাকের জবাব না দিয়ে পারি না।

এবার ডেকেছেন। হবে বোধহয় তার বান্ধবীর ছেলের জন্মদিন, গিফট চয়েস করে দিতে হবে। অথবা তার কোনো বন্ধুর মেয়ের কান ছিদ্র করার অনুষ্ঠান। এই সব সামান্য ব্যাপারেও আমাকে তিনি জরুরি তলব করেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধ বালকের মতো তার কথায় সাড়া দিয়ে চলি।

যাই হোক। এবারও ইউনিভার্সিটির ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ফাকি দিয়ে পরদিনই আমি রুবিআপার বাসায় চলে গেলাম। সন্ধ্যাবেলায় তাদের ঘরে তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না। সে সময় অবশ্য সারা দেশেই ঘন ঘন লোডশেডিং চলতো। সদর দরোজা খুলে দিয়ে কাজের মেয়ে জানালো, রুবিআপা তার বেডরুমেই শুয়ে আছে। বাসায় তখন আর কেউ ছিল না। চার পাশের ভ্যাপসা গরম, বাতাসে একটা বিশ্রী রকমের অস্বস্তি বিরাজ করছিল।

আমার গলার আওয়াজে বিছানা থেকেই রুবিআপা আমাকে ডাকলেন। হাতের ব্যাগটা সদর দরজার কাছে মেঝেতে রেখে আমিও সোজা তার রুমে ঢুকে গেলাম। রুমটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। বড় বড় তিনটা জানালার বিশাল সব পর্দাগুলো খুলে দেয়া। তবুও আধার কমছে না। হাতড়ে হাতড়ে রুবি আপার বিছানার কাছে গিয়ে দাড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। কিছুক্ষণ পর আবছা আধার কেটে গেলে অন্ধকারে বিলক্ষণ বুঝতে পারলাম তার দেহের ঊর্ধাংশ পুরোটাই অনাবৃত। গা-টা কেমন শির শির করে উঠলো।

তোকে ডেকেছি দুই চারটা জরুরি কথা বলবো বলে। একটু বস, আমি বাথরুমে গিয়ে কাপড় পরে আসি।

টর্চলাইট নিয়ে তিনি বাথ রুমে ঢুকলেন।

রুবি আপা এমনই। আমিও এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তাই তার প্রতি আমার আলাদা কোনো ফিলিংসও নেই।

তিনি বাথরুম থেকে ফিরে আসার আগেই ইলেকট্রিসিটিও চলে এলো। মুখোমুখি খাটের ওপর আমরা দুজন। ঠিক আমার চোখের দিকে তাকিয়েই রুবিআপা বললেন, সাথীকে চিনিস না! আমার ননদ, ওর তো আড়াই মাসের বাচ্চা পেটে। হারামজাদি গ্রামের হলেও শহরে এসেই দুই নাম্বারি করে পেটে বাচ্চা বাধিয়ে বসে আছে। আমার মনে হয় চাচাতো দেবর খসরু, ওই যে হ্যাংলা-পাতলা, দাত উচা ছেলেটা এখানে মাঝে মধ্যে আসতো এটা তারই কাজ। তুই কি বলিস?

রুবিআপার কথায় কেমন বড় একটা ধাক্কা খেলাম। সাথী তো খুব ভালো মেয়ে। বোরখা পরে, নামাজি। তার সম্পর্কে এসব কি বলছেন আপা। আর খসরুও তো বেশ বিনয়ী। সাথীর সঙ্গেই চিটাগাং কলেজে পড়ে। খসরুও নামাজি। চুপ থেকেই ভাবতে লাগলাম।

সাথীর ভাই অর্থাৎ আমার স্বামীকে সবই ফোনে বলেছি। সে বলেছে, অপারেশন করিয়ে ফেলতে। কিন্তু হারামজাদি কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। তাই গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি। বিয়েও একটা ঠিক করে ফেলেছি। কালই বিয়ে। তোকে খবর দিয়েছি আমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবি। নোয়াখালির অনেক কিছুই আমি জানি না।

রুবিআপার কথা মতো সাথীর বিয়ের দুদিন পরই আমি হলে ফিরে এলাম। নিজের কাছে কেমন জানি পুরো ব্যাপারটাকেই ঘাপলা মনে হলো। কারণ সাথী প্রেগনান্ট সত্য হলেও স্বেচ্ছায় যে এটা করা হয়নি এটাও সত্য। সাথীকে যতোখানি জানি সে সত্যিই ভালো মেয়ে। তার মতো পরহেজগার,

ভালো বিনয়ী মেয়ের পক্ষে পাপাচার করা সম্ভব নয়। দুই একদিন পর তাই এক রাতে হুট করেই রুবিআপার বাসায় গেলাম।

স্বামীহীনা যৌনআবেদনময়ী রুবিআপার ভেতর থেকে অনেক অজানা ইতিহাসই কায়দা করে বের করে ফেললাম। ভেতরে ভেতরে অসম্ভব কামুক এ নারী পরকীয়া প্রেমিকের মাধ্যমে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে প্রায়ই সাথীর সঙ্গে দেহ লীলায় মত্ত হতো। স্বামীও তার বীভৎস চরিত্রের। বৌকে দেশে রেখে বিদেশের বারে হোটেলে পরনারীতে মজে থাকেন। রুবিআপা সবই জানতেন। স্বামীর প্রতি ক্ষোভ মেটাতে না পেরে কলেজ পড়ুয়া তার নিরীহ বোনকেই সে শিকার করতো মাঝ রাতে পরকীয়া প্রেমিকের সাহায্যে।

আমাকে এতো সব বলেছেন তিনি। কেন বলেছেন? আমি এর জবাব কিভাবে দিই? নারী যতোই উদ্দাম হোক না কেন পুরুষের কাছে কারো না কারো কাছে আজীবন সেই নারীই থাকে। স্নেহময়ী, মাতৃরূপী। রুবিআপাও আমার কাছে সে রকম। তিনি আমাকে সব পাপ ইতিহাস বলে হালকাই হতে চেয়েছেন।

ময়মনসিংহ থেকে

অস্বস্তিকর

দ্বিধাহীন কণ্ঠে সে আমায় চাচ্চু ডেকে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেও তাকে আম্মুর স্থলে উ-ম-উ বলে চুমু দিতাম এক অস্বস্তিকর মনোভাব নিয়ে। অস্বস্তিকর হলেও ওই কাজটি ক্রমবর্ধমান হারে করে যাচ্ছিলাম।

তার স্নিগ্ধ, মায়াবী মুখটিতে একাধারে হাজারটা চুমু খেতে পারলেও আমার তৃপ্তি আসবে না। তার হালকা-পাতলা লম্বা দেহের বয়ঃসন্ধিকালে সদ্য পরিবর্তিত গঠনগুলো জামার ফাক দিয়ে পলকহীন চোখে দেখেছি। একটি বিকাশমান কিশোরীর দেহের আকৃতি, গঠন ও রঙ এতো সুন্দর হতে পারে তা ছিল কল্পনাতীত। কদাচিৎ ইচ্ছাকৃতভাবে অনিচ্ছাকৃতের ছলে সে সৌন্দর্য ছুঁয়েও দেখেছি।

দূরসম্পর্কের ভাইয়ের মেয়ে হলেও সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে সে ছিল আপনতুল্য। এমন সামাজিক সম্পর্কের অবস্থান এবং এক যুগের বেশি বয়সের ব্যবধান আমার মধ্যে অপরাধ বোধ জাগিয়ে তুললে পিছু হঠে যাই।

কিন্তু কিছুদিন কাটার পর অপরপক্ষ সামনে আসতে থাকে। আড়ালে-আবডালে সে আমাকে চুপ করে একটা চুমু দিয়েই তা ফেরত চায়। একই বয়সী তার ঘনিষ্ঠ কাজিনটির সঙ্গে আমি কথা না বললে ভীষণ খুশি হয়। বিনা দর্শনে কেবল মোবাইলে কথা বলে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল গভীর সেসব বিষয় জানার আগ্রহ তার চরমে উঠলো। কতোদিন পর আমার বিয়ে হবে? চাচ্চুর বিয়েতে সে নিমন্ত্রণ পাবে কি না? এসব প্রশ্নের উত্তরে যখন বলেছি, তার মতো ছোট্ট সুন্দর মেয়ে না পেলে কোনোদিন বিয়েই করবো না তখন তার চোখে মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পলকের মধ্যে শব্দ করে আমার মুখে একটি চুমু দিয়েই তা ফেরত চেয়ে চোখ বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকে। আমিও তখন কৃপণতা করিনি।

বর্তমানে আমার অবস্থান শত মাইল দূরে। তার মুখটি একনজর দেখার জন্য ব্যাকুল থাকি। এনডাবলিউডি কল করে বাসার অন্যদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু তাকে ডেকে দেয়ার অনুরোধ জানাতে সংকোচ লাগে। সমস্যা হচ্ছে, তার ফোন রিসিভ করার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। এদিকে ফোন করে কথা না বলার জন্য সে প্রচণ্ড অভিমান করে বসে আছে। এমন অবস্থায় অভিমানীর মান ভাঙতে গিয়ে আমার অস্বস্তিকর কাজগুলোর আখ্যা কি হবে? ভালোবাসা, নাকি বিকৃত মানসিকতা?

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অনুতাপ

– প্রিন্স

আজ আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা পাঠকদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি পারতাম এসব কথা পাঠকদের না বলতে। কিন্তু এ জন্যেই বললাম যে, সবাই অনুভব করুক আমার কষ্ট এবং শিখুক...।

দেড় বছর আগে আমি একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছিলাম। এলাকার সবাই আমার দাপটে কাপতো। পরিবারে ছিল আমার মা ও একমাত্র ছোট বোন পনি। পনি আমার একমাত্র ছোট বোন হওয়ায় তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। আমার সন্ত্রাসী গ্রুপের লিডার ছিলাম আমি। সোহেল, মাসুদ, সুমনসহ আমার অনেক সদস্য ছিল। জীবনে অনেক খুন করেছি। অনেকের কাছ থেকে চাদা নিয়েছি। অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছি। কোনো সুন্দরী মেয়ে চোখে ধরলেই তাকে তুলে এনে ব্যবহার করতাম। অনেকের কাছে প্রেম প্রস্তাব করতাম। রাজি না হলে এসিডে ঝলসে দিতাম তার সুন্দর রূপ।

মা আমার সম্পর্কে জানতেন না। তাকে কখনো বুঝতে দিইনি আমি কি করি। আমার সম্পর্কে আমার ছোট বোন পনি সামান্য জানতো। তবুও সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। প্রেমিকা রুমা আমার সঙ্গে প্রতারণা করায় আমি সহ্য করতে পারিনি। আমি চাইনি সে আর কারো হোক। তাই নিজের হাতে ঝলসে দিয়েছি রুমার সুন্দর মুখ। দলের সদস্যদের জানিয়ে দিলাম তোদের যাকে পছন্দ হয়, তুলে নিয়ে এসে আনন্দ করবি। বাড়াবাড়ি করলে এসিডে ঝলসে দিবি। এভাবে প্রতিনিয়ত অপরাধ করেই চললাম। আমার মনুষ্যত্বটা লোপ পেয়ে পশুত্বটা জেগে উঠেছিল।

একদিন একটা বিশেষ কাজে জেস গার্ডেন পার্কে বসে আছি। মোবাইলে রিং হলো। ধরলাম। সোহেল বললো, ভাই, একটা খাসা মাল ধরছি। আপনি ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। তবে মেয়েটা খুব জেদি। গালিগালাজ করছে। এখন ঘরে আটকে রেখেছি।

মন ভালো না থাকায় সোহেলকে জানিয়ে দিলাম, আমি আসবো না। এক সময় পার্কে বসে বিকেল হয়ে এলো। আমি উঠে টাউন হল মাঠে মেলায় এলাম। পনির পছন্দের কিছু জিনিসপত্র কিনলাম। তারপর চলে এলাম বাসায়। বাসায় পৌছাতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। বাসায় ফিরে দেখি অনেক লোক। মা কাদতে কাদতে আমার কাছে ছুটে এলেন। আমাকে বললেন, প্রিন্স, পনিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে কলেজে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। কলেজ, হাসপাতাল সমস্ত জায়গায় খোজ নিয়েছি। কোথাও পাওয়া যায়নি।

খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। খুব খারাপ লাগছিল। কারণ তাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। ভাবলাম কোনো ছেলের প্রেমে পড়ে চলে গেল কি না। কিন্তু পনিকে তো আমি খুব ভালো করে চিনি। তার সমস্ত কথা আমাকে খুলে বলতো। তার কোনো প্রেমিকই ছিল না। তাছাড়া থাকলেও এভাবে আমাদের কষ্ট দিয়েও যেতো না। গেলেও কোনো মাধ্যম জানাতো।

হঠাৎ মনে পড়লো দুপুরে সোহেল আমাকে বলেছিল তারা একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে ভোগ করার জন্য। সে আমার বোন পনি নয় তো? না, না, তারা আমার বোনকে নিয়ে যেতে পারে না। কিছু ভালো লাগছে না। তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে ছুটে চললাম তাদের কাছে। আস্তানার সামনে যেতেই সুমন বললো, ভাই, মেয়েটা খুব জেদি ছিল। আমাদের গালিগালাজ করছিল। তাই মাসুদ তাকে এসিড মেরেছে।

সুমনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম। তারপর ছুটে গেলাম ঘরে। দরজা খুললাম, দেখলাম আমার একমাত্র আদরের ছোট বোন পনি এসিডদগ্ধ হয়ে উলঙ্গ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। তাকে ডাকলাম।

তার জ্ঞান ফিরলো। ভাইয়া বলে আমাকে জড়িয়ে ফুপিয়ে কাদতে লাগলো। আমাকে বলতে শুরু করলো, ভাইয়া, তুই তো সন্ত্রাসী। তোর বোন কেন এসিড দগ্ধ হয়, তোর বোন কেন ধর্ষিত হয়। নিজের ছোট বোনকে রক্ষা করতে পারিস না। কেমন মাস্তান তুই?

কোনো কথা বললাম না। চুপ করে থাকলাম। আমার বোনের ধর্ষণের জন্য আমিই দায়ী। আমার নিষ্পাপ বোনের মুখটা নিজেই এসিডে ঝলসে দিয়েছি।

তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। মাকে খবর পাঠালাম। তারপর সেখান থেকে চলে এসেছি অনেক দূরে। জানি আমার মা সারা জীবন আমাকে ঘৃণা করবেন। আমার বোন সারা জীবন আমাকে অভিশাপ দেবে। আমার ভালোবাসার ছোট বোনের সুন্দর মুখটা এসিডে ঝলসিত দেখে সহ্য করতে পারবো না। তাই অনেক দূরে অবস্থান করছি। কতোদিন মাকে দেখিনি, পনিকে দেখিনি। কেমন আছে জানি না। একা একা আজ নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।

পনি, লক্ষ্মী বোন আমার, তোর এ পাপী ভাইয়াকে ক্ষমা করিস। আমি তোর জীবনের আশা–আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সব কিছু ভেঙে দিয়েছি। আমাকে অভিশাপ থেকে মুক্তি দে। যায়যায়দিনের *ফাল্গুনে ভালোবাসা* সংখ্যার মাধ্যমে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করিস।

এখন প্রতিদিন পত্রিকা দেখি। একটা সংবাদই খুজি। আমার কোনো ছোট বোন কোথাও ধর্ষিত হলো কি না, এসিডদগ্ধ হলো কি না।

যশোর থেকে

ফুলশয্যা

– লুকায়িতা

বিষাদ ভরা জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা ভেতরে কাজ করতে শুরু করলো। সেটা হলো, আমার বিয়ে। এখন আমি যদি বিয়ে করি তাহলে অনেকেই শান্তি পাবে। ফিরে পাবে তাদের

হারানো সুখ শান্তি। পূর্ণ হবে সকল আশা আকাঙ্ক্ষা। পাত্র খুজতে লাগলাম। বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিজ্ঞাপনও দিলাম।

কিছুদিনের মধ্যে পাত্রও পেলাম উপযুক্ত। তার মাঝে পছন্দনীয় কি কি আছে খুজলাম না। তবে অপছন্দনীয় যা তা সবই আমার চোখে ধরা পড়লো প্রথম দেখাতে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম এটাই আমার প্রয়োজন। আমাকে শাস্তি পেতে হলে এটাই উপযুক্ত। তাই হাতছাড়া না করে মোটামুটি ধুমধামের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গেল।

পরদিন শ্বশুরবাড়ি গেলাম। এলো আমার কাঙ্ক্ষিত ফুলশয্যা। রাত দশটায় আমাকে নির্দিষ্ট একটি ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। সে ঘরে অল্প আলোয় একটি হারিকেন জ্বলছে। সে সারা রাত জ্বলে জ্বলে আমাদের পাহারা দেবে আর উপভোগ করবে আমাদের ফুলশয্যার আনন্দটুকু। এসব ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে। গায়ের গহনা খুলে বিছানায় গেলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ সে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানলো। আমি খুব একটা বাধা দিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে সে তার কাপড় খুলে ঝাপিয়ে পড়লো আমার ওপর।

বিধাতার কি লিখন, সে তার বিশেষ অঙ্গটি কিছুতেই কার্যক্ষম করতে পারলো না। সেকেন্ডের মধ্যে সে অক্ষম হয়ে গেল।

সে ছটফট করে বললো, ইশ কি হলো, হচ্ছে না কেন? তোমাকে তো দিতে পারলাম না। আসলে এ সময় আমি বিয়ে করতে চাইনি। বাড়ির চাপে করতে হলো। ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করেছি। বলেছে, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।

বললাম, থাক আর চিন্তা করতে হবে না।

আমি পেটিকোট পাল্টিয়ে শুয়ে পড়লাম। এক দারুণ কষ্টে রাতটা পার করে দিলাম। এ হলো এক কাঙ্ক্ষিত ফুলশয্যার অভিজ্ঞতা।

চারদিন পরে আমার বন্ধু, আমার পরশ, আমার হৃদয়ের কাছে ফোন করলাম। সে অনুরোধ করলো দেখা করতে।

তার কাছে গেলাম। আমাকে দেখেই সে পাগলের মতো করতে লাগলো। আমাকে গলা টিপে মারতে চেষ্টা করলো। আমার কাপড়ে ঢাকা হাতের শাখা জোড়া ভাঙতে চাইলো। আমার অনেক অনুরোধে রক্ষা পেলাম। কিন্তু আমার সিথির সিদুর সে সহ্য করতে পারলো না। কাপড়ে থুথু দিয়ে মুছে ফেললো। আমি শুধু মুখ টিপে হাসলাম।

সে দ্বিতীয়বার ব্লেড কিনিয়ে আনিয়েছে। তার আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে সিথি লাল করবে। আমি সহ্য করতে না পেরে বাধা দিলাম। তবুও সে কৌশলে আমার ব্যাগ থেকে একটি পুরনো ব্লেড বের করে আঙুল চিরে রক্ত দিয়ে সিথিটা আমার লাল করে দিল। বললো, এবার ঠিক আছে।

আমি বললাম, এতে কোনো কৃতিত্ব নেই। এ কাজটি কেন আগে করিসনি? এখন লজ্জা করছে না। একজনের দেয়া জায়গায় আবার দিচ্ছিস? তোকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম। তুই গুরুত্ব দিসনি। এখন কেন এতো কষ্ট?

সে বললো, আমি বুঝতে পারিনি আমার এতো কষ্ট হবে।

যে রবিবারে একজন সোনার আংটিতে সিদুর লাগিয়ে আমার সিথি লাল করে দিয়েছিল ঠিক তার পরের রবিবারে অন্য আরেকজন নিজের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আমার একই সিথি রাঙিয়ে দিল। হে বিধাতা! তুমি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও আজ।

কয়েক দিন পরে আমার হৃদয়ের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। আমাকে এবার সে নানান প্রশ্ন করলো। এক সময় সে বললো, একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো। সত্যি কথা বলবে। তাহলে আমি ভালো থাকবো। বিয়ের দিন থেকে আমার সাথে আবার দেখা হওয়া পর্যন্ত কিভাবে রাত কেটেছে, কি কি ঘটনা ঘটেছে, এ গল্প আমাকে সত্যি সত্যি বলবে।

বললাম, প্লিজ, আমাকে ক্ষমা করো। এখন জানতে চেও না। আমি বলতে পারবো না। আরও কিছুদিন পরে বলবো।

সে নাছোড়বান্দা। বললো, ঠিক আছে, সব না হোক, বাসররাতে, ফুলশয্যা এগুলো বলো। আমি শুনবো। আমি সহ্য করতে পারবো।

বললাম, বলতে পারি একটি শর্তে।

বলো কি শর্ত।

শর্ত হচ্ছে, কথাগুলো বলার পরে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছাড়া তুমি অন্য সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

শর্ত মেনে নিল। বললাম ফুলশয্যার কাহিনী। প্রথমে আমার স্বামীর দুর্বলতা গোপন রেখেই বলেছিলাম। কিন্তু তার হুল ফোটানো কিছু কথা আমাকে বাধ্য করলো সত্যি কথা বলতে।

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললো, তাহলে তো আমার কিছু নষ্ট হয়নি। সবই রয়েছে। বলেই আমাকে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল।

কখন যেন দুজনেই উত্তেজিত হয়ে কি যেন ঘটে গেল। অনুভব করলাম এক অদ্ভুত তৃপ্তি। পূর্ণ হলো আমার কাঙ্ক্ষিত ফুলশয্যার সুখ–শান্তি। যে মঙ্গলবারে নতুন একজন ব্যর্থ হলো ফুলশয্যার সার্থকতা আনতে ঠিক তার পরের মঙ্গলবারেই পুরনো সেইজন ফুলশয্যায় ভরে দিল পূর্ণতা।

কি এক অদ্ভুত গরমিল এই ডাবল বিয়ের ডাবল ফুলশয্যায়।

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে

ভয়াল

– নবীউল ইসলাম রবিন

মনে অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে এসএসসি পাসের পর ভর্তি হলাম বগুড়া সরকারি আযীযুল হক কলেজে। নতুন ক্লাস, নতুন বন্ধু–বান্ধবী, নতুন পরিবেশে যা দেখি তাই নতুন, রঙিন মনে হয়। কিন্তু কলেজে ক্লাস শুরুর প্রথমেই হোচট খেলাম ভালো কোনো আবাসিকের অভাব দেখে। এই কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনো আবাসিক হস্টেল নেই। বাধ্য হয়েই ছাত্রছাত্রীদের থাকতে হয় কলেজের আশপাশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মেসগুলোতে।

আমিও উঠে পড়লাম তেমনি একটা ছাত্রাবাসে। কয়েকদিন পরেই টের পেলাম পরিস্থিতি কতো ভয়াবহ। পড়াশোনার পরিবেশ নেই। তার ওপর স্থানীয় মাস্তানদের উপদ্রব। নিয়মিত চাদা দিতে হয়

তাদের। তাছাড়া প্রতিদিনই গাজা, মদ, ফেনসিডিল আর জুয়ার আসর বসে। ককটেল থেকে শুরু করে ছোটখাটো আগ্নেয়াস্ত্রও বানানো হয় এসব মেসে।

ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও নিয়মিত ক্লাস এবং লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ১৯৯৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বন্ধুরা সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম পরদিন ভালোবাসা দিবস পালন করার। কলেজের প্রথম ভালোবাসা দিবস। মনে অন্য রকম আনন্দ। ঠিক এমন সময় লক্ষ্য করলাম, স্থানীয় মাস্তান ধরনের কিছু ছেলের আনাগোনা আমাদের ছাত্রাবাসে। প্রতিদিনের স্বাভাবিক অত্যাচারের কথা চিন্তার করে আমরা খুব একটা পাত্তা দিলাম না। কিছুক্ষণ পরে টের পেলাম তাদের আজকের আড্ডা অন্যান্য দিনের চেয়ে ব্যতিক্রমী। তারা আজ রাতে তাস, গাজা আর ফেনসিডিলে আবদ্ধ থাকবে না। কারণ তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলাম মুখ বাধা অবস্থায় একটি মেয়েকে। বয়স আঠারো উনিশ। চোখে অজানা ভয়ের আশংকা। মুখ বাধা থাকায় কথা বলতে না পারলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি সে এই পশুগুলোর হাত থেকে তাকে বাচানোর আবেদন করছে আমাদের দিকে।

মাস্তানদের লিডার আমাদের বললো একটা রুম ছেড়ে দেয়ার জন্য। আমরা যারা দশ বারোজন ছাত্র ছিলাম তারা এক সঙ্গে প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তারা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। অস্ত্রের মুখে একটি রুমে আমাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হলো। আর অন্য রুমে মেয়েটির ওপর তারা পর্যায়ক্রমে পাশবিক অত্যাচার চালালো সারাটি রাত। কি ভয়াবহ ছিল সেই রাতটি।

মেয়েটিকে তারা কোথা থেকে এনেছিল আর তার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, আমরা কিছুই জানতে পারিনি। কারণ আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল ওই এলাকা ছাড়তে।

প্রতিবার ভালোবাসা দিবস এলেই মনে হয় সেই ভয়াল রাতের কথা। শুনতে পাই নাম না জানা সেই মেয়েটির আর্তনাদ।

ময়মনসিংহ থেকে

চর্চা ও পরিচর্যা

– ডা. এম. এ বারী

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, *আমি ইহাকে পাইলাম।* তিনি কি করে এতো সহজে হৈমন্তীকে পাইয়ে দিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু আমি তাকে কখনোই পাইনি। কেবলই খুজে মরছি। যদিও বা কখনো মনে হয়েছে, এই বুঝি পাবো আর তখনই দেখেছি চঞ্চল অঞ্চল উড়িয়ে তিনি অপসৃয়মাণ!

আসলে পাওয়া এতো সহজ নয়, আদতেই সম্ভব কি না সে বিষয় প্রবল সন্দেহ আছে। হাজার সংসার তল্লাশি করে, এমনকি *অপারেশন ক্লিন হার্ট* চালিয়ে দেখলেও একটি যুগল নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসায় এখনো কাতর হয়ে আছেন এমনটি পাওয়া অসম্ভব না হলেও বিস্ময়কর তো বটেই!

তাই *আমি ইহাকে পাইলাম* এ কথা সত্যি নয়। তবুও যদি সত্যি বলে মানতেই হয় তাহলে বলতেই হবে এবং *আমি ইহাকে পাইয়াই হারাইলাম।*

পৃথিবীর সর্বোচ্চারিত একক শব্দ সম্ভবত ভালোবাসা। গাছের প্রতি যাদের ভালোবাসা আছে তারা গাছ লাগানোর আগেই তার পরিচর্যার তাবৎ কলাকৌশল রপ্ত করে নেন। গাছ জীব হলেও মানুষের

মতো প্রতিক্রিয়াশীল নয়। কাজেই মানুষের ভালোবাসার ক্ষেত্রে ভালোবাসার পরিচর্যা হতে হবে আরো বেশি সংবেদনশীল। ভালোবাসা পাওয়া কঠিন। কিন্তু তাকে গতিশীল রাখা কঠিনতর বৈকি! মনুষ্য জাতির ভালোবাসা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানবিক গুণাবলীর একটি। ভালোবাসাহীন জীবন ধারণ সম্ভব হলেও জীবন যাপন সম্ভব নয়। আমাদের নৈমিত্তিক জীবন যাপনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ভালোবাসা। তাই সুষম ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার নিত্য পরিচর্যা অনিবার্য।

আমাদের সমাজে পঞ্চাশ বছর আগেও ভালোবাসা শব্দটির উচ্চারণ ও গর্হিত বলে বিবেচিত হতো। কালক্রমে ভালোবাসা সূর্যালোক দেখেছে বটে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ভালোবাসার সঙ্গে প্রতারণা সমতালে এগিয়ে চলেছে। অন্যদিকে ভালোবাসার প্রকৃত স্বরূপ অনেকের কাছেই এখনো কুয়াশাকৃত, স্পষ্ট নয়। বাংলায় ভালোবাসা শব্দটির বহুমাত্রিক সংজ্ঞা ও ব্যবহার থাকলেও ভ্যালেনটাইনস ডে–র ভালোবাসা সুনির্দিষ্ট এবং আপন বৈশিষ্টমণ্ডিত। এ ভালোবাসা নারী–পুরুষের মনোদৈহিক এক জটিল, অথচ স্বাভাবিক আকর্ষণজনিত ভাবাবেগে পুষ্ট। একে রোমান্স ও সেক্স থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। এ ভালোবাসা রোমান্স ও সেক্স এতোটাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, চাল ও ডালের খিচুড়ি থেকে যেমন তার উপাদানগুলোকে আলাদা করা অসম্ভব তেমনি এদের উপাদানগুলোকে ভিন্নভাবে দেখার কোনো উপায় নেই।

ভালোবাসা শব্দটির উচ্চারণ আজ আর গর্হিত না হলেও সেক্স শব্দটি উচ্চারণে আমাদের রাখঢাক আছে। আসলে সেক্স শব্দটি নিজেই প্রবল সেক্সি। আমরা সেক্স উচ্চারণে যতোটা অনাগ্রহী, কর্মক্ষেত্রে ততোটাই তৎপর। সাড়ে তিন কোটি পূর্ব পাকিস্তানি (১৯৬১) এখন যে তেরো কোটিতে পৌছেছে তা যেন আকাশ থেকে আসা। সেক্স বা যৌন মিলন ছাড়া এ দেশে কি বাচ্চা জন্মানো সম্ভব? আরো মজার ব্যাপার হলো, মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের ইমাম সাহেবদের সন্তান সংখ্যা একই পর্যায়ের শিক্ষিত অন্য পেশার লোকজনের দ্বিগুণ তিনগুণ। সেক্স উচ্চারণে যাদের লজ্জা, কর্মক্ষেত্রে তারাই অধিক গতিশীল!

প্রশ্ন উঠতে পারে, দৈহিক চাহিদা কি ভালোবাসার জন্য অপরিহার্য? উত্তর আপনি চিন্তা করলেই খুজে পাবেন। কোনো মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কি আপনি ভালোবাসায় আবদ্ধ হতে চান? ভালোবাসায় দৈহিক চাহিদা একটি অপরিহার্য ও অনিবার্য উপাদান।

ভালোবাসা পাওয়া এবং অন্যকে ভালোবাসা একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার পর আপনার মৌলিক অধিকার। এর যথাযথ প্রয়োগ আপনার সুখময় জীবনের অনন্য উপাদান। কাজেই এ বিষয় আপনার বিশদ ও গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

ভালোবাসার কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, নেই কোনো সূত্র। সেদিক থেকে ভালোবাসা রহস্যমণ্ডিত এবং সম্ভবত সেটাই আমাদের অভিভূত করে। তবু সাধারণ কিছু টিপস আপনার সহায়ক হতে পারে যা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত, পরিসংখ্যানের মাধ্যমে নয়।

ভালোবাসার আগেই ভালোবাসার পরিচর্যা বিষয়ে সচেতন হন। আপনি জেনে নিন তার খাদ্যাভাস, শখ, ধর্মীয় অনুভূতি, নৈতিকতা, শিল্প–সাহিত্য, সুর ও সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ, গৃহপালিত প্রাণী, ফুল, পাখি, নৈসর্গ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ ভ্রমণ, সমাজসেবা প্রভৃতি বিষয় তার মনোভাব। এক কথায় আপনার সঙ্গে তার চিন্তা–চেতনা ও মূল্যবোধে কতোটা মিল রয়েছে। যদি

মিলের পরিমাণ ৭০%য়ের কম হয় তাহলে আপনার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। মনে রাখবেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ককে আর নতুন করে গড়ে নেয়া যায় না। দৈনিক জনকণ্ঠের পাঠকের সঙ্গে যাযাদির পাঠকের ভালোবাসা হবে না। যদি হয় তাহলে সেটা মসৃণ হবে না। আশা করি, এই একটি উদাহরণ আপনার চিন্তাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য যথেষ্ট। নিচে কিছু টিপস দেয়া হলো যা সম্পূর্ণ নয়, হয়তো আপনার কাজে আসতে পারে।

ভালোবাসার আগে :

এক. আপনি কি তার আগমনের জন্য পরিপাটি হয়ে দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করেন? তিনিও কি আপনার মতো সমতালে আচরণ করেন?

দুই. আপনার সামগ্রিক মূল্যবোধ কি তার কাছাকাছি?

তিন. আপনার পৈতৃক আর্থ-সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে তাদের কম বেশি খাপ খাইয়ে নেয়ার সঙ্গতি আছে কি?

চার. প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় আপনাদের রেজাল্ট কি কাছাকাছি বা সমপর্যায়ের?

পাচ. আপনার রসবোধে তিনি কি উৎফুল্ল হন, না বিরক্ত হন? ভালোলাগার প্রাথমিক ঘোর কেটে গেলে তাকে রসবোধসম্পন্ন মনে হয়?

ছয়. আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি কি মনোযোগ দিয়ে শোনেন? তাদের সম্পর্কে কি আগ্রহ দেখান? সম্মান দেখিয়ে মন্তব্য করেন?

শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসা অসম্ভব কুৎসিত।

সাত. আপনার শারীরিক অসুস্থতা, কোনো প্রকার দৈন্যতা বা অন্য কোনো দুর্বলতা কি তার মনে ভালোবাসার জন্ম দিয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে সেটা ভালোবাসা নয়, করুণা! করুণাময় ভালোবাসা সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, এটা একটা কপট মহানুভবতা প্রদর্শন এবং তা ক্ষীণায়ু।

আট. ভালোবাসার সহজাত দাবি হচ্ছে শারীরিক সান্নিধ্য। তিনি কি সে রকম আগ্রহ দেখান?

নয়. তিনি কি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অতিমাত্রায় উৎসাহী? তাহলে আপনাকে সচেতন হতে হবে। না হলে আপনি প্রতারিত হতে পারেন।

দশ. তিনি কি স্বাভাবিক নিয়মে তার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আপনাকে এবং আপনার আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিজকে পরিচিত করাতে আগ্রহী? আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা এটা করতে চান।

এগারো. তিনি কি প্লিজ, সরি এবং থ্যাংক ইউ বলতে শিখেছেন? এ তিনটি শব্দ উচ্চারণে তার চোখেমুখে কি আনুপাতিক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে? যিনি শেখেননি তিনি ফ্লেকসিবল নন, মার্জিত নন, রুচিশীল নন, কৃতজ্ঞ নন।

প্রাপ্ত ভালোবাসার পরিচর্যা

কিভাবে করবেন?

এক. নিজস্ব বৈশিষ্ট অটুট রেখেই ছাড় দেয়ার অভ্যাস করুন।

দুই. ভালোবাসার পূর্ব অধ্যায়ের মতো সাজসজ্জা বজায় রাখুন।

তিন. কখনোই সন্দেহপ্রবণ হবেন না। সম্যক উপলব্ধি করুন ও যুক্তিবাদী হন।

চার. তৃতীয় পক্ষের উড়ো কথা বিশ্বাস করবেন না, বিশেষ করে পরিচয়বিহীন টেলিফোন। তিনি আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী নন।

পাচ. ছুটির দিনের সকালটি সকল দ্বন্দ্ব অবসানের জন্য বরাদ্দ করুন। অন্য ছয় দিন পরস্পরের মনোমালিন্যের কারণ ডায়রিতে নোট করে রাখুন। সরাসরি আপনারা আলোচনা করুন, দেখবেন ৯০% ছিল বোঝাবুঝির ভুল।

ছয়. যে কোনো কেনাকাটার প্রশংসা করুন। কারণ সবাই সাধ্যমতো ভালো জিনিসটি কিনে আনতে চায়। দ্রব্যটি মুখ্য নয়, আবেগই মুখ্য এভাবে মূল্যায়ন করুন।

সাত. তার আত্মীয়-স্বজন, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের তালিকা সংগ্রহে রাখুন এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাদের নিমন্ত্রণের আগ্রহ দেখান।

আট. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। পেয়ে গেছি না ভেবে নিত্যনতুন করে পাবার অভ্যাস করুন। আমরা প্রতিনিয়তই পাল্টে যাই সবাই সেভাবেই তাল মেলাতে চেষ্টা করুন।

নয়. ভালোবাসা পাহারা দিয়ে রাখা যায় না সত্যি। কিন্তু গুছিয়ে রাখা যায়। পরকীয়া প্রেমের বহুলাংশই ঘটে অতি পরিচিতজনদের মধ্যে। এ ব্যাপারে সচেতন থাকুন।

দশ. নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা। তাকে বুঝতে দিন, যে কোনো দুর্যোগে আপনি তার পাশে আছেন হিমলায়ের মতো।

এগারো. যদি আপনাদের বিছানা সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে কোনো অবস্থায়ই বিছানা ছেড়ে সোফায় যাবেন না। বিছানা ছাড়তে হলে ভেবে-চিন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তবেই ছাড়বেন। তার আগে নয়। মনে রাখবেন, অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমাদের দ্বন্দ্ব নেই, আছে অতি পরিচিতজনদের সঙ্গে। ভালোবাসা থাই এয়ারলাইন্সের বিজ্ঞাপনের মতো Smooth as silk (সিল্কের মতো মসৃণ) নয়। সন্ধ্যা রাতের বৈশাখি ঝড়ের তাণ্ডব ভোর রাতের চিরন্তন দৈহিক মিলনে শেফালি ঝরা সকাল বয়ে আনে এমন অজস্র প্রমাণ আছে।

পরিশেষে বলবো, পৃথিবীতে একটিই মাত্র খেলা আছে যেখানে কোনো রেফারি নেই, যেখানে প্রতিপক্ষকে হারাতে নয় জিতিয়ে দিতেই অন্যপক্ষ অধিক আগ্রহী এবং জিতিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। আর তারই নাম ভালোবাসার খেলা।

ঢাকা থেকে

ভাইয়ের মতো

– মিলন

স্কুল জীবন শেষ করে কলেজ জীবনে পা রাখলাম। তখন মনটা উড়ু উড়ু ভাব। রক্তে নতুন প্রেমের এনজাইমের ঘনঘটা। যাকে দেখি তাকে ভালোলাগে। কিন্তু ভালোবাসি বা ভালোলাগে এই দুটো কথা বলার মতো ভাষা প্রয়োগের মতো সাহস নেই। তাই শুধু বন্ধুদের প্রেমের পত্রে কতো রঙ বেরঙয়ের কথোপথনের আকাবাকা লেখা দেখে নিজকে শিহরিত করতাম। অপরিচিত ভালোলাগা কাউকে যখন নিজের কথাগুলো বলতে পারলাম না তখন এমন সময় এসে গেল এক সুযোগ।

আমার এক খালাতো বোন নোয়াখালি থেকে ঢাকা এসেছে বেড়াতে। সে উঠেছে আমার এক মামার বাসায়। মাঝে মধ্যে আমিও মামার বাসায় যাই। এখন যাওয়াটা একটু বেড়ে গেল। উদ্দেশ্য খালাতো বোন রিয়ার সঙ্গে গল্প করা।

একদিন মামা আমাকে ডেকে বললেন মিলন, রিয়া এসেছে কয়েকদিন হলো, তুমি তাকে একটু সময় দিও। ঢাকার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো একটু দেখিও।

মনে মনে যা চাইলাম তা হলো। আমি তো খুশিতে ভেতরে আটখানা। তাকে নিয়ে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে গেলাম। এক সঙ্গে, একই রিকশায় ঘুরতে যে মজা সেটা কাউকে বোঝাতে পারবো না। রিয়ার শরীরের সুমিষ্ট গন্ধ যেন আমাকে পাগল করে দিল। রিয়াকে মনের কথাটা কি ভাবে বলি? একদিন বোটানিকাল গার্ডেনে বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ তার চোখের দিকে নজর করে যেন আমার মনটা ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কিছু বলবো। কিন্তু ভয়ে আবার হিম হয়ে গেলাম। তারপর সাহস করে তাকে বলে ফেললাম, রিয়া, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

সে যেন একটু চমকে উঠলো। বললো, কথা তো সারাক্ষণ বলছো। আবার কি কথা?

কথাটা বিশেষ।

তাহলে বলেই ফেলো তোমার বিশেষ কথাটা কি?

সাহস করে বলেই ফেললাম। রিয়া, তোমাকে আমার ভালোলাগে। তাই তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

রিয়া একটু অন্যমনস্ক হয়ে মুচকি হেসে বললো, চলো মিলনভাই, আজ উঠি।

সেদিন রিয়া আমার সঙ্গে আর বিশেষ কথা বললো না। তাকে মামার বাসায় পৌছে দিয়ে বাসায় এলাম। তারপর ক্যাসেট প্লেয়ারে আমার প্রিয় একটা গান ছেড়ে তন্দ্রার ভাব ধরে রিয়ার হাসি মাখা মুখ নিয়ে কল্পনা করছিলাম। রিয়ার হাসিতে মনে হলো যেন রিয়া আমাকে চায়। খুশিতে সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে শেভ করলাম, যা দরকার সব ধরনের প্লাস্টার মুখে লাগালাম। তারপর ধীরে ধীরে মামার বাসায় গেলাম। দরজায় টোকা দিতেই রিয়া এসে দরজা খুলে দিল। দেখলাম রিয়ার হাতে গরম চা।

আমাকে বললো, চা খাবে নাকি?

বললাম, মন্দ না চলে।

সে এক কাপ গরম চা এনে আমার সামনে চেয়ারে বসলো। সে বিভিন্ন কথার মাঝে একটু হেসে আমাকে বললো, মিলনভাই তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাই না?

আমি কোনো কথা না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বললো, আমি তোমাকে ভাইয়ের মতো দেখে আসছি। এখনো ভাইয়ের মতো জানি।

এরপর রিয়ার সামনের থেকে চলে এলাম বাসায়।

সারা রাত-দিন শুধু স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ছটফট করলাম। এভাবে অনেক দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমালাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, অনেক পয়সা দরকার আমার। কারণ সেই দিন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকাতে আমার ভালোবাসা শব্দটি প্রত্যাখ্যান হয়েছে।

এখন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। আমি বিয়ে করেছি। আমার সুন্দরী বৌ আছে। আমার ফুটফুটে সুন্দর ছেলে আছে। কিন্তু আমার জীবনের প্রথম ভালোলাগার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। মনে হয় কখনো ভুলতে পারবো না। যেন মাঝে মধ্যে আমার কানে বাজে *তুমি আমার ভাইয়ের মতো* শব্দটি।

মন্ট্রিঅল, কানাডা থেকে

জয়

– মাহমুদা সিদ্দিকা পাপড়ী

৭ জুলাই ১৯৮৭। স্থান আর্টস বিলডিং। সদ্য অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। সকাল দশটায় ক্লাস। অধীর আগ্রহে স্যারের জন্য অপেক্ষা করছি নতুন পাওয়া বান্ধবী নাজু, সোহানা, বন্যা, জেসমিনসহ। কার বাড়ি কোথায়, কে কোন কলেজ থেকে এসেছি এই নিয়ে আড্ডা আর কারণে অকারণে হাসাহাসি চলছিল। আমরা দাড়িয়ে আছি তিন তলার ব্যালকনিতে। হঠাৎ পুরুষ কণ্ঠে শুনতে পেলাম, এক্সকিউজ মি, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

তাকিয়ে যাকে দেখলাম তার মতো মানুষকে হরদমই রাস্তাঘাটে দেখা যায় পেপার পত্রিকা অথবা ফুটপাথে ফল–মূল বিক্রি করতে। তাই অনাগ্রহ আর অনিচ্ছাসহ তাকাই তার দিকে। পরনে পুরনো জিন্সের প্যান্ট, পায়ে স্পঞ্জ গায়ে শাদা পাঞ্জাবি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিমেষেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। কেননা আগ্রহ জাগানোর মতো এক্সট্রা কোনো কোয়ালিটি খুজে পেলাম না।

এক্সকিউজমি। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

বলুন।

আপনার নাম কি মাহমুদা সিদ্দিকী?

না।

তাহলে? কিন্তু আমি তো শুনেছি আপনার নাম মাহমুদা সিদ্দিকী।

বললাম তো না। আমার নাম মাহমুদা সিদ্দিকা।

ওই হলো আর কি।

না। হলো না। সিদ্দিকী আর সিদ্দিকা–র মধ্যে অনেক তফাত।

আচ্ছা বেশ।

আচ্ছা, কি বলতে এসেছেন বলে ফেলুন ঝটপট। এক্ষুণি স্যার ক্লাসে ঢুকবেন। আমার সময় নেই।

উত্তর এলো, দশটার ক্লাস হবে না, স্যার নেই।

বললাম, না থাকলেও আমি ক্লাসে যাচ্ছি। বলে বান্ধবীদের নিয়ে সদর্পে ক্লাসে ঢুকে যাই। পনেরো বিশ মিনিট ধরে বসে থেকেও স্যারের দেখা নেই। আড্ডা দিয়ে অপেক্ষায় থেকেও স্যার না আসায় ক্লাসের ছেলেরা খবর নিয়ে জানালো সত্যি স্যার নেই, ক্লাস হবে না।

বের হয়ে কমন রুমের দিকে যেতেই শুনতে পেলাম, কি, বললাম না, ক্লাস হবে না।

গা জ্বলে গেল এ রকম মোড়লিপনা দেখে। বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল। বললাম, কি বলবেন বলে ফেলুন।

আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি আপনাকে ভালোবাসতে চাই।

জীবনে অজস্রবার এ রকম পরিস্থিতির মুখে পড়েছি। তাই হেসে বললাম, খুবই ভালো কথা। আমাকে আপনার ভালো লেগেছে ভালোবাসতে চান, বাসুন, কোনো অসুবিধা নেই। বলেই হাটতে শুরু করেছি।

কমনরুমের সামনে এসে কখন যে চারিদিক থেকে ঘেরাও হয়েছি টের পাইনি। ইদুর-বিড়াল খেলার মতো কখন যে দশ বারোজন ছেলের বৃত্তের ভেতর আটকা পড়েছি বুঝতে পারিনি।

আমার প্রশ্নের উত্তর তো দিলেন না? প্রশ্ন এলো সেই হকারের মতো দেখতে লোকটির কাছ থেকে।

বললাম, আমাকে আপনার ভালো লেগেছে ভালোবাসুন। ভালো যে কারো কাউকে লাগতেই পারে। ভালোবাসতে ইচ্ছা হলে বাসবেন, কোনো অসুবিধা তো দেখছি না।

আপনি?

আমার তো আপনাকে ভালো লাগেনি। তাই ভালোবাসার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু আমি তো আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি প্রথম দেখাতেই। আমার এই জীবনে আপনাকে অবশ্যই চাই।

সেটা আপনার ইচ্ছা।

দেখবো, আপনি আমাকে কিভাবে ভালো না বেসে থাকতে পারেন।

বেশ তো। এই ক্যাম্পাসে আমাকে সাত বছর থাকতে হবে। আপনি এতোদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে দেখতে পরেন।

হেটে চলে যাই বৃত্ত ভেঙে বাইরে। বান্ধবীরা উৎসুক হয়, জানতে চায় কি বললো? সংক্ষেপে জানাই তাদেরকে। আমার নাক-কান-গলা দিয়ে ঝাঝ বের হতে থাকে। এতোটা উত্তেজিত কখন হয়েছি বুঝতে পারিনি। যাক, হাপ ছেড়ে বাচলাম সফলভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছি বলে।

পরদিন ক্লাসে ঢোকার মুখে আবার দেখলাম সেই মূর্তিকে। সঙ্গে একদল বন্ধু। তারা দিনে দিনে পরিচিত থেকে বন্ধুত্বের খাতায় নাম লেখালেও ঘটনার নায়কের সঙ্গে কোনো কথা বলার মতো সুযোগ দিতে আমি রাজি নই। তাকে দেখি কখনো ডিপার্টমেন্টের সামনে আম গাছের বাধানো চত্বরে, কখনো বা লাইব্রেরির সামনের ভাঙা দেয়ালে বসে থাকতে। তার বন্ধুরা দলে দলে আমাকে দেখতে আসে। কারণ সে নাকি তাদের হিরো, তাদের লিডার। তারা কেবলই বন্ধুর গুণগান করতে থাকে আর তার সঙ্গে সম্পর্ক হলে আমার জন্য যে কতো ভালো হবে সেটার বর্ণনা দিতে থাকে। বন্ধুদের ভাষ্য মতে, সে খুব ভালো খেলোয়াড়, খুব ভালো ছাত্র এবং খুব ধনীর সন্তান ইত্যাদি। সে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নানান রকম চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় নিশ্চুপ হয়ে যায়।

এভাবে চলতে চলতে রমজানের ছুটি এগিয়ে আসে। বন্ধের আগের দিন সে আমাকে বললো দেখো, আমাকে পছন্দ করো না ঠিক আছে। প্লিজ, আমাকে একটু তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দাও।

একটু বুঝি মায়াই হলো। বললাম, আপনি তো আমার বন্ধু হতে পারেন।

উত্তর এলো, আমি কখনোই তোমার বন্ধু হতে পারবো না। আমি তোমার প্রেমিক ও স্বামীই হবো।

বন্ধুরা অনুরোধ করলো, সামনে তার অ্যাডমিশন টেস্ট। তাকে একটু বুঝিয়ে বলো যেন পড়াশোনাটা ঠিক মতো করে। বুয়েট বা বিআইটিতে চান্স না পেলে ইউনিভার্সিটিতে ইংলিশে ভর্তি হলেও পড়বে না। তুমি একটু সহযোগিতা করলে সে নিশ্চয়ই ভালো জায়গায় চান্স পাবে।

অনুরোধে ঢেকি গিলতে নিজের পায়ে কুড়াল মারলাম। রাজি হলাম কথা বলতে।

জুলাইয়ের ২৭ তারিখে সাইকোলজি সাবসিডিয়ারি ক্লাস থেকে বন্ধুদেরকে নিয়ে জিওলজি মাইনিং বিল্ডিংয়ের একটি ক্লাসে বসলাম। বন্ধুরা আমাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে বাইরে অপেক্ষায় থাকলো। ভাবলাম শুধু তো তার সঙ্গে একটু কথা বলবো এই তো।

মুখোমুখি বসলাম। বললাম, কেন এমন পাগলামি করছেন? আমার মতো এমন মেয়ে তো হাজার হাজার আছে। যখন প্রতিষ্ঠিত হবেন তখন আমার মতো মেয়ে হাজারটা আপনার জীবনে আসবে।

সে বললো, তুমি আমার হাতে হাত রাখো। আমি তোমার জীবনের সব আশা, সব স্বপ্ন পূরণ করবো। আমি তোমার মনের মতো হবোই শুধু তুমি আমার সঙ্গে থাকো। আমাকে এখন তোমার পছন্দ হচ্ছে না ঠিকই। কিন্তু একদিন এই আমাকে নিয়ে তোমার গর্ব হবে।

কিছু না ভেবে না বুঝেই বললাম, ঠিক আছে। এখন ঠিক মতো পড়াশোনা করো। ভালো জায়গায় চান্স পাও। তখন দেখা যাবে।

বন্ধ ঘরে আলো–আধারি পরিবেশে কখন যে তাকে তুমি বলেছি তাও জানি না। সে টুক করে উঠে দাড়িয়ে আমার কপালে আলতো চুমু দিয়েই এক ছুটে বাইরে দৌড়।

বন্ধুদের চিৎকার করে বলছে আর দৌড়াচ্ছে, আমি পেরেছি, আমি পেরেছি তাকে জয় করতে।

সে তার সব কথাই রেখেছে।

১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯৪ দীর্ঘ সময়ে অনেক প্রেম, অনেক বিরহ, অনেক ভালোবাসা, অনেক যন্ত্রণা পার হয়ে আজ আমরা দুই পুত্রের জনক–জননী। সেই হকারের মতো চেহারার মানুষটিকে তিলে তিলে, যত্নে, ভালোবাসায় রাজপুত্রের মতো বানিয়েছি। তাকে নিয়ে এখন আমি সত্যিই গর্ব করতে পারি। সে এখনো আমার জন্য দুষ্টু–মিষ্টি পাগলপারা একজন মানুষ যে নিত্য নতুন রঙ– গন্ধে আমাকে ভোলায় ভালোবাসার পৃথিবীতে।

সাহেব বাজার, রাজশাহী থেকে

ম্যাজিস্ট্রেটের মা

– বীরাঙ্গনা

আমাদের বাসার শেষ প্রান্তে আমার মামার ছোট্ট এক টুকরো জমিতে ম্যাজিস্ট্রেটের মায়ের বাস। মামা দয়া করে থাকতে দিয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে জন্ম দিয়ে তার মা মারা যান। তার কয়েকমাস পর ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা সাবেক প্রেমিকাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন মা করে ঘরে নিয়ে আসেন।

একদিন আমাদের কাজের ছেলে তোরাব আলী এসে বললো, *আফা, ম্যাজিস্ট্রেটের বাবায় একটা নতুন বৌ আনছে। হয়! বিয়া কইরা আনছে।*

ধমক দিয়ে বললাম, তাতে তোর কি? যা এখান থেকে।

পরদিন সকাল সাতটার দিকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা লাল জরির শাড়ি পরা, নতুন বৌ নিয়ে আমাদের বাসায় হাজির। তোরাব আলী তাদের বরণ করে ভেতরে নিয়ে এলো। আব্বার অফিস। আমাদের স্কুল কলেজের সময়। বড় বিরক্ত লাগছিল।

নতুন বৌ আব্বা মাকে সালাম করে আমার দিকে এগোচ্ছিল। আমি বাধা দিয়ে উঠিয়ে দেখলাম!

সে ঘোমটাটা অর্ধেক নামিয়ে নিজ থেকেই বলতে শুরু করলো, *আমার নাম লাইলি বেগম। বাপ নাই, মা আছে।* আমার কিছুটা কাছে এসে বললো, *আফা উনি আমারে ভালোবাইস্যা বিয়া করছে,* বলেই মুচকি হাসি দিল।

আব্বা বের হয়ে গেলেন। মা একশ টাকা বৌয়ের হাতে দিয়ে বললেন, মা মরা ছেলেটাকে আদর–যত্ন করো।

বৌ মাথা নাড়লো।

মা তাদের নাশতা খেতে দিলেন।

আমি কলেজের উদ্দেশ্য চলে গেলাম।

শুরু হলো লাইলির জীবন সংসারের নতুন অধ্যায়। স্বামীর রিকশা চালানোর সামান্য রোজগারে তিনজনের অভাবের সংসার।

লাইলি অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের নতুন মা ম্যাজিস্ট্রেটকে কোলে নিয়ে প্রায়ই আমাদের বাসায় এসে বসে থাকতো। টুকটাক কাজ করে দিতো। বিনিময়ে খেতে পেতো। কখনো চালতে ডাল এবং কিছু টাকাও মা দিয়ে দিতেন।

মাত্র দুই বছরে ম্যাজিস্ট্রেটের মায়ের সেই সতেজ, সরল কিশোরী চেহারা এক অর্ধবয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ঝগড়াঝাটি, মারামারি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছিল। মারের যন্ত্রণায় মাঝে মধ্যে দুই একদিন শয্যাশায়ী হতেই হতো ম্যাজিস্ট্রেটের মাকে।

আমাদের বাউন্ডারি দেয়ালের সঙ্গে একটা নারিকেল গাছ অর্ধেক শরীর বাকিয়ে তারপর সোজা হয়েছে। আমি এবং মা প্রায়ই ওই গাছের বাকা অংশে দাড়িয়ে দেয়ালের ওপর দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের মায়ের কান্নাকাটি, আর্তনাদ দেখতাম। সান্ত্বনা দিতাম। এমনকি মারামারির সময় তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিতাম।

এভাবেই দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল। দুঃখ–কষ্ট, অভাব–অনটনে হারিয়ে গেল লাইলির ভালোবাসার রঙিন স্বপ্ন। জোড়াতালি দিয়ে চলছিল শাদা কালো জীবন। আরও এক সন্তান এলো লাইলির কোলে। রাগে–দুঃখে লাইলি যখন বাচ্চা দুটোকে বেদম মার দিতো। তখন নির্বোধ হয়ে বসে থাকতাম আর ভাবতাম, এদের পৃথিবীতে কেন পাঠালে? হে বিধাতা!

একদিন রাত দশটার দিকে আমি পড়ায় মগ্ন। হঠাৎ রাতের নীরবতা ভেঙে ম্যাজিস্ট্রেটের মায়ের গলা ফাটানো চিৎকার আর চোর পেটানোর মতো লাঠি পেটার শব্দ। গর্জিত পুরুষ কণ্ঠ – *খানকি মাগি... তোরে আর রাখুম না। আজই তোরে ছাইড়্যা দিমু।*

মেয়েলি আর্তনাদ, না...আপনের পায়ে ধরি, আমারে মাইরা ফালান। তবুও এমন কথা কইয়েন না।

বাচ্চার কান্না, মায়ের কান্না, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না আর। কিছুক্ষণ পর কান্নার আওয়াজ, যেন ধীরে ধীরে আমাদের গেটের দিকেই আসছিল। আমি এবং মা উদ্বিগ্ন হয়ে গেটে গিয়ে গেট খুলতেই দেখি, ম্যাজিস্ট্রেটের মা কোলের মেয়েটিকে নিয়ে এদিকেই আসছেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা মেয়েটিকে টেনে নিয়েই বললেন, *ওই মাগি, আমার মাইয়া দিয়া যা।*

ম্যাজিস্ট্রেটের মা গেটের সামনে বসেই বিলাপ শুরু করে দিল।

আমরা ধরে ভেতরে নিয়ে এলাম।

মা বললেন, শোনো, কান্না বন্ধ করো। কি হয়েছে সেটা বলো।

মায়ের পায়ে জড়িয়ে গলার স্কেল আরেক ধাপ বাড়িয়ে, *খালাগো আমি অহন কই যামু? হেয় তো আমারে তিন কতা কইয়া দিছে। আল্লারে, আমি কই যামু?*

মা বললেন, শোনো, এতো রাতে চিৎকার থামাও। আজ আমাদের এখানে থাকো। কাল দেখা যাবে কি হয়।

ছয় সাত দিন যাবৎ ম্যাজিস্ট্রেটের মা আমাদের বাসায়। আমাকে একা পেলেই অতীতের স্মৃতিচারণ শুরু করে। বলে, *আফা মানুষ এতো ভালোবাসার মানুষডারে কেমনে ছাইড়া দেয়? বিয়া না অইলেই ভালোবাসা বাইচ্যা থাকে। আমারে কতো ভালোবাসতো, লাল ফিতা, কাচের চুড়ি কিইন্না দিতো, সিনেমায় লইয়া যাইতো। রিকশায় কইরা ঘুরাইতো, হু...হু...এখন কি অইলো?*

আমি মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, তাহলে এতো ভালোবাসা নষ্ট হলো কেন?

ম্যাজিস্ট্রেটের মা চোখ মুছে ক্ষোভের সঙ্গে বললো, *অভাব! অভাবই আমার স্বপ্নডারে ভাইঙা দিছে। আফা, আমার সংসারডারে টুকরা কইরা দিছে। জীবনডারে শেষ কইরা দিছে। যাগো পেটে দুইবেলা খাওন জোটে না। ইজ্জত ঢাকবার কাপড় পায় না, বাচ্চার দুধ জোটে না, তাগো আবার ভালোবাসা? ভালোবাসা কেমনে থাকে? থাকে না, থাকে না।* বলতে বলতে কান্না শুরু করলো।

ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে সম্ভবত ভালোবাসার টানে এবং আমার মায়ের প্রচেষ্টায় ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা তার স্ত্রীকে ঘরে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সামাজিকতায় *হিল্লা* না করে ঘরে তোলা যাবে না।

ম্যাজিস্ট্রেটের মায়ের সোজা কথা, *আমি কোনো পাপ করিনি। দরকার হলে সব ছাইড়্যা চইলা যামু। তবুও হিল্লায় যামু না।*

এরপর কোলের মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে দিয়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেটের বাবা। ম্যাজিস্ট্রেটের মা কাজের সন্ধানে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। আর কোনো খোজ পাইনি আমরা।

ইটালি থেকে

হ্যাভেনে

– ত.ম

হিথরো এয়ারপোর্টে বসে আকাশ–পাতাল ভাবছিলাম। দেশ থেকে এক বন্ধু আসছে। তাকে রিসিভ করতে আসা। অনেক রকম ভাবনাই মাথায় আসছিল। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি ঘুরপাক খাচ্ছিল তা হলো যাতায়াত খরচ।

লন্ডন পুরো শহরটা ছয়টা জোন (Zone)–এ বিভক্ত। নির্দিষ্ট একটা জোনের জন্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক টিকেট কেটে বাস, পাতাল রেলে যতোবার ইচ্ছা ঘোরা যায়। এদিক থেকে হিসাব করলে বলা যায়, লন্ডনে যাতায়াত খরচের বাজেট মাসের শুরুতেই করা যায়। কিন্তু সেই বাজেটে বাড়তি পাউন্ড যোগ হয় যদি বন্ধু দেশ থেকে আসে এবং তাকে রিসিভ করতে আসতে হয়! ভুলে যাবেন না, তার কাছে কিন্তু পাউন্ড নেই। অতএব তার–আমার বাসা পর্যন্ত আনা, ফিরে যাওয়ার ভাড়া থেকে শুরু করে মোটামুটি এক সপ্তাহ তার বাসা না পাওয়া পর্যন্ত আবার বাসা পেলেই তো হবে না তার ভর্তি, একটা পার্টটাইম কাজ যোগাড় করার আগ পর্যন্ত টুকটাক খরচ। এ রকম বহু হাবিজাবি ভাবছি আর লন্ডনের মতো চরম প্রফেশনাল জায়গায় ফ্রেন্ডশিপের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছি। এমন সময় সাহেব এলেন। আবার চোখে সান গ্লাস। হারামজাদা...

কি রে, খবর কি? কোনো সমস্যা হয়নি তো? জিজ্ঞাসা করলাম।

কিসের জবাব। সাহেব লন্ডনের রাস্তা গিলে খাচ্ছে। আমিও আর বিরক্ত করলাম না। তবে লন্ডনের যেসব জায়গার ব্যাপারে জানি সেগুলোর ব্যাপারে ছোটখাটো টিপস দিতে থাকলাম।

সে আমার কথা শুনছে আর হা করে দেখছে।

মনে মনে বললাম, দেখো বাবা, দেখো, এই প্রথম আর শেষ দেখা। ক্লাস শুরু হলে চাদ–সুরুজ দেখার সময় থাকবে না। আর ভ্যাকেশন? হাহ... সে সময় ১০০ মাইল বেগে পাউন্ডের পেছনে দৌড়াও।

বাসায় এসে ঘড়ির দিকে তাকিয়েই তার চোখ কপালে।

দোস্ত, এখানে এখন রাত আটটা, তার মানে দেশে রাত দুটো, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। বলেই পড়ে ঘুম।

আমি তার সুটকেসগুলো জায়গা মতো রেখে নিজেও বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে ভাবছি, যাক, রান্না করা লাগলো না, সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন।

দেশে মেসে কিংবা বিদেশে যারা নিজে নিজে থাকেন তারা অন্তত বৌয়ের কাছ থেকে একটা ডায়ালগ কখনোই শুনবেন না। সেটা হলো, আজকে চুলা বন্ধ, কোনো রান্না–বান্না নেই...। কারণটা নিশ্চয়ই আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।

সাত সকালে ওঠা আমার অভ্যাস করতে হচ্ছে। কারণ আমাকে ক্লাস ধরার জন্য একদিকে তৈরি হওয়া, অন্যদিকে সকালের নাশতা ও দুপুরে লাঞ্চের জন্য কিছু তৈরি করা। তবে আজকে সকাল সাড়ে ছয়টায় উঠতে হলো। কারণ আজ আমি একা নই, সঙ্গে অতিথিও আছেন। যাহোক, বন্ধুর নামটা আপনাদের বলেই ফেলি। ইমরান। অন্য নাম তানভীর।

ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম তানভীর বিছানায় নেই। একটু অবাক হলাম। কারণ এখনো সকাল পুরোপুরি হয়নি। আর ও টায়ার্ড থাকারই কথা। এতো তাড়াতাড়ি উঠলো কিভাবে? বাথরুমে দেখলাম নেই। পাশের ছোট্ট স্টাডি রুমে দেখলাম, নেই। বারান্দায় এসে যা দেখলাম তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তানভীরের হাতে একটা ছবি ধরা আর সে চেয়ারে বসে পা তুলে মাথাটা হাটুতে গুজে নিঃশব্দে কাদছে। ছবিটা তাদের ফ্যামিলির। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এর আগেও বহুবার পড়েছি। প্রথম কিছুদিন সবারই মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে। পরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়।

বিভিন্ন কথা বলে তানভীরকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। এমন সময় আরেক ফ্রেন্ড ফোন করলো। গলায় উচ্ছ্বাস।

হ্যালো। কি রে খবর কি?

দোস্ত আমরা সবাই...যাচ্ছি। মনে আছে, আজকে ১৪ ফেব্রুয়ারি?

ভ্যালেনটাইনস ডে। তুই তাড়াতাড়ি চলে আয়।

মনে প্রচণ্ড খারাপ একটা গালি এসে গেল। মুখ সামলে বললাম, যেখানে যাবি কতো ভাড়া যাবে জানিস? ওটা ভিন্ন জোনে। আর জানিস যে, আমি উইকএন্ডে কাজ করি। আমার সরল জবাব।

আমি জানতাম, সবাই গেলেও তুই যাবি না...।

সে আরো অনেক কিছু বলছিল। আর আমার মনও একটু একটু করে বদলাচ্ছিল। যাই না একদিন, কতো আর খরচ হবে! ওভারটাইম করে পুষিয়ে নেবো। আর তানভীরেরও মন খারাপ। সব মিলিয়ে সম্মতি দিয়েই দিলাম, ঠিক আছে তোরা রেডি হ, আমি আর তানভীর আসছি।

আসলে এখানে আমাদের ফ্রেন্ড সার্কলটা পুরোটা একটা পরিবারের মতো। কারণ দেশে হস্টেলে থাকলে অসুখ-বিসুখ, নানান বিপদ-আপদে বাবা মাসহ অন্যরা এগিয়ে আসেন। কিন্তু এই বিদেশ বিভূইয়ে সেটা সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, আন্টিরা ফোন করে আমাদেরকেই বলেন, বাবা, আমার ছেলের দুধ নিয়মিত খাওয়ার দায়িত্বটা তোমাকেই দিলাম। আরও কতো কি। বিশেষ করে ছুটির দিনে যখন এক সঙ্গে ঘুরতে বের হই কিংবা মুভি দেখতে বসি তখন নিজেদেরকে জগতের সবচেয়ে সুখী মানুষ ভাবতে থাকি। সব মানসিক যন্ত্রণা নিমেষেই উধাও হয়ে যায়।

সবাই টিকেট করে ট্রেনে চেপে বসলাম। আস্তে আস্তে ট্রেন চলতে শুরু করলো আর খরচ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা কমতে থাকলো। তবে আন্ডারগ্রাউন্ডের মতো বিরক্তির জার্নি কখনো করি না। মাটির নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলা আর কোনো সাইট ভিউইং নেই। আমাদের রুমকী অবশ্য কখনোই ট্রেনে চড়বে না। (বিভ্রান্ত হবেন না, রুমকী ছেলেরই নাম, তবে নামটা আমাদের দেয়া, ঘুমের মধ্যে বার বার এই নামটা ডেকে জেগে ওঠার পরিণামস্বরূপ)। যতো দেরিই হোক বাসই তার বাহন। তবে আজকে আমাদেরকে সঙ্গ দেয়ার জন্যই সে ট্রেনে উঠলো। আমাদের সবারই একটা করে উপনাম আছে এবং তার ইতিহাসও অবশ্যই আছে। যেমন বেকহ্যাম, বেকহ্যামের সঙ্গে ছবি তুলতে সফল হওয়ায়।

আজকের এই ভ্রমণের প্রস্তাবক ও পথপ্রদর্শক নওশাদ ওরফে বেকহ্যাম। আড্ডা দিতে কখন যে স্টেশন এসে পড়লো টেরই পেলাম না। তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন থেকে বের হয়েই আমার চোখ চড়কগাছ। স্বপ্ন দেখছি না তো। না স্বপ্ন নয়, বাস্তব। এও কি সম্ভব! রাস্তার ওপারে বিরাট এক হৃদয়! আই মিন হার্ট। বিরাট এক হার্ট। হার্টকে শরীর থেকে বের করে আনলে রক্তে ভেসে যাওয়া বস্তুটির রঙ যে রকম হবে, আমার সামনের বস্তুটির রঙও অবিকল সে রকম। রক্তাক্ত। এতো বড় হার্টও পৃথিবীতে থাকতে পারে সেটা আমার ক্ষুদ্র ধারণায় গণ্ডির বাইরে ছিল।

বাহারের ধাক্কায় হুশ ফিরে এলো। বোকার মতো কি দেখিস, এই হলো আমাদের আজকের যাত্রাতীর্থ, ভ্যালেনটাইনস হ্যাভেন।

রাস্তা পার হয়ে ভ্যালেনটাইনস হ্যাভেনের একবারে সামনে এসে দাড়ালাম।

অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত। কি বিশাল এর আয়তন! বিশাল এই রহস্যময় ভবনটি যেন চুম্বকের মতো মানুষ টানছে।

গেটের সামনে দাড়ানো মাত্রই হার্ট আকৃতির বিশাল অটোমেটিক দরজা খুলে গেল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম।

সদর দরজার পরেই বিশাল হলরুম। হলরুমের ঠিক মাঝখানে বিশাল বড় পর্দার চারটি টিভি স্ক্রন, চারদিকে ঘুরিয়ে দেয়া। অর্থাৎ পুরো হল রুমের প্রতিটি স্থান থেকেই টিভি দেখা যাবে। টিভিতে রোমান্টিক মিউজিক ভিডিও দেখাচ্ছে। তবে গানগুলো খুব নমনীয় সুরের। ফলে হলরুমের আলো ছায়ার সঙ্গে এই হালকা সুরের ঢেউ অদ্ভুত একটা আবেশ তৈরি করেছে। আমরা এগোলাম।

হলরুমের বামদিকে মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপহার সামগ্রীর সংগ্রহ। কারণ পুরো একটা সার্কল জুড়ে আর্চিস, হলমার্ক, এথিনা, এদের বিরাট বিরাট শো রুম।

কালো, শাদা, লম্বা, খাটো, চিকন, স্বাস্থ্যবান হাজারও মানুষ। কেউ একা, কেউ প্রিয়ার কোমরে হাত দিয়ে, কেউ বিষণ্নতা কিংবা প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার কষ্ট ভুলতে আর কেউ ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পেয়ে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করার জন্য উপহার সামগ্রী কিনছে। বাইরের চেহারা যাই হোক না কেন, এদের ভেতরে একটি ব্যাপার সবার ক্ষেত্রেই এক আর তা হলো প্রেম।

উপহার সামগ্রীর সংগ্রহ দেখে আমার মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। সারা দুনিয়ার ভূগোলের জ্ঞান নিয়ে এরা উপহার বানায়। যেমন ইজিপ্টের পিরামিডের ডামি কিংবা খেজুর গাছের সঙ্গে ঝুলন্ত রসের কলসি। ডোডি আল ফায়েদের পৃথিবীর বৃহত্তম দোকান *হ্যারডস*-এর ঠিক উল্টোদিকে এর অবস্থান হলেও দাম একেবারে হাতের নাগালে।

সব ধরনের মানুষ, সব আয়ের মানুষ উপহার কিনছে। বছরের এই দিনটিতে হাজারো দুঃখ- কষ্টের মাঝেও মানুষ প্রিয়জনকে বলতে চায় ভালোবাসি।

উপহার সামগ্রীর দেখাদেখির পালা শেষ হওয়ার পর আমরা সামনে এগোলাম।

পাখির ডাকে হঠাৎ চমকে গেলাম। হরেক রকম পাখির ডাক মিলে মনে হলো গ্রামের বাড়ির ভোরবেলা। গাছপালা দেখে আরো অবাক হলাম। গাছপালা, কৃত্রিম হ্রদ, পাখির ডাক সব মিলিয়ে অদ্ভুত মন ভালো করে দেয়া পরিবেশ। কৃত্রিম ছোট-বড় গাছ আর এর ফাকে ফাকে যুগলরা বসে। সম্ভবত এটি তৈরি করেছে *স্টারবাকস* কফি কম্পানি। কারণ এই নয়নাভিরাম প্রেম অভয়ারণ্যের ঠিক মাঝেখানে দ্বীপের মতো তাদের শপ এবং সেখান থেকে জুটিদেরকে খাবার যোগান হচ্ছে। তবে এই ব্যবসা নিঃসন্দেহে ঢাকায় টিকবে না। কারণ লন্ডনের এই হিমশীতল তাপমাত্রায় পার্কে বসতে গেলে সেটা জীবনের শেষ প্রেমও হতে পারে।

মলিন স্বরে প্রিয়ম বললো, চল দোস্ত, এই এলাকা আমাদের না।

ঠিক কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলাম।

চলন্ত সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো কিছু চিত্রকর্মের ওপর। রোমান কৃশ্চিয়ান পাদরি সেন্ট ভ্যালেনটাইনস, ক্লাডিয়াস থেকে শুরু করে টাইটানিকের রোজের চিত্রকর্মটিও আছে। প্রেম এদের জীবনকে আলোকিত কিংবা আলোচিত করেছে। তবে একটা ছবির বড় অভাব অনুভব

করলাম, আমাদের হু. মু. এরশাদ সাহেবের। শিশির যদি এই ছবিটা আকেন তাহলে ছবিটা এখানে ঝোলানোর চেষ্টা অবশ্যই করবো।

দোতলায় গানের মায়াবী সুরের বদলে র‍্যাপ, ক্লাসিক, স্লো কিংবা হাই নানান রকম গানের সম্মিলিত সুরের আওয়াজে মেজাজ একটু বিগড়ে গেল।

গানের এ এক বিশাল জগৎ। তিনটা রেকর্ড কম্পানির সম্মিলিত শো রুম। নাম *মিউজিক ওয়ার্ল্ডের* ঠিক নিচেই এদের স্লোগান। The biggest Music Collection of the World.

ভেতরে ঢুকে এদের স্লোগানের সঙ্গে একমত না হয়ে পারলাম না। সেই ষাটের দশকের গ্রামোফোনের বিশাল ডিস্ক থেকে শুরু করে হালের এমপি–ফোর কিংবা ডিভিডি–র ছড়াছড়ি। তবে এলবাম রাখার ব্যাপারে এদের কোনো নাক উচু ভাব নেই। ছোট–বড়, অখ্যাত, কুখ্যাত ব্যান্ড কিংবা একক এলবামে ঠাসা। সারি সারি র‍্যাকে সিডি কিংবা অডিও সাজানো। দর্শকরা ঘুরে ঘুরে দেখছে। তবে মজার ব্যাপার হলো, কোনো সিডি কিংবা ক্যাসেটই প্যাকেট করা নেই। ফলে শ্রোতারা এলবামটি নিয়ে প্রতিটি সারির শেষে দাড়িয়ে থাকা চেকিং বক্সে সিডি কিংবা ক্যাসেট চালিয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনতে পারেন। এরপর ভালো লাগলে তাৎক্ষণিকভাবেই চেক করতে পারেন এর স্টক কি রকম আছে। এর জন্যও অনেকগুলো কমপিউটার রয়েছে। শুধু গান নয়, এই শো রুমের আরেকটা বড় আকর্ষণ হলো, প্রায়ই কোনো না কোনো পপস্টার আসছেন। ভক্তরা অটোগ্রাফ নিচ্ছে, ছবি তুলছে।

ঢোকার পথে বিশাল পোস্টারে আজকের আকর্ষণ হিসেবে কৃস্টিনা এডগুইলারা–র কথা বলা হয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত তার কোনো নামগন্ধ দেখছি না। আসবে হয়তো কোনো সময়। এর শেষ এলবামের একটা গান খুব হিট করেছে। সেটা বার বার বাজানো হচ্ছে।

গানের জগৎ পেরিয়ে এবার এলাম বাইরের জগতে। ফয়েলস, ডাবলিউ.এইচ. স্মিথ, বুকস এটসেটেরাসহ কয়েকটি কম্পানির বিশাল ভ্যালেনটাইস কালেকশন। ছোট–বড় অনেক লেখকের প্রেমের গল্প উপন্যাসের বিশাল ভুবন। কৃস্টিনা না এলেও এখানে দেখতে পেলাম হ্যারি পটার খ্যাত জে. কে রাউলিংস। এখানে তাকে বেশ বেমানান মনে হলেও ভক্তরা কিন্তু ঠিকই তাকে ঘিরে রেখেছে। গত বছর একেবারে শেষ দিকে হ্যারি পটার মুক্তি পাওয়ার পর এর ছবিওয়ালা টি শার্ট, টাওয়েল, ক্যাপ এগুলো বেশ জনপ্রিয় হয়। টাইম মেশিনের এই যুগেও অনেকটা রূপকথা জাতীয় এই কাহিনী পাঠকরা বেশ পছন্দ করেছেন। লন্ডনের হলগুলোতে এটা এখনো চলছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় ১১ মিলিয়ন পাউন্ড কামিয়েছে।

আমরা ঘুরে ঘুরে বইয়ের বিশাল জগতে হাটছিলাম। তবে এই জগতে ডুব দিতে পারছিলাম না যেমনটি করছে স্থানীয়রা। এর একমাত্র কারণ *ইংরেজি /* বাংলা একাডেমির *বই মেলায়* গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা শুধু বইয়ের বাইরের চেহারা দেখি না। বইটা খুলি, মাঝখানের পুরো একটা পাতা হয়তো পড়েও ফেলি।

ইরোটিকা অর্থাৎ যৌন আবেদনমূলক জাতীয় বইয়ের প্রচুর কাস্টমার দেখেও অবাক হলাম। অবশেষে বেরিয়ে এলাম।

এ ধরনের একটা শপিং মল-এ অর্নামেন্টস থাকবে না তা তো হয় না। আছে ঠিকই তবে তা গতানুগতিক অলংকারের দোকান থেকে একটু ভিন্ন। অলংকার বিক্রির পাশাপাশি এরা বিভিন্ন ধরনের ট্যাটুস কিংবা উল্কিও পরায়। বড় পর্দার টেলিভিশনে সার্বক্ষণিক এই উল্কি পরিহিত মডেলদের মুখ ও মোহনীয় ভঙ্গিমায় হাটা-চলা দেখানো হচ্ছে। তবে প্রায় জুটিই এ বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য দুজনেই একই রকম ট্যাটুস পড়ছে। কিন্তু ব্যাপারটা বিবিসির নজরে পড়লে নিশ্চয়ই তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করবে। কারণ বিবিসি ট্যাটুস বা উল্কির বিরুদ্ধে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে।

অলংকারের বৈচিত্র দেখার মতো। সোনা কিংবা রূপা থেকে শুরু করে বাশ, বেত অথবা প্লাস্টিক দিয়ে অদ্ভুত সব ডিজাইন। সারা দুনিয়া থেকে এরা ডিজাইন এবং উপকরণ সংগ্রহ করে। ফলে এদের কাস্টমারও বিশ্বব্যাপী।

হঠাৎ একজন স্যান্ডউইচম্যানকে দেখলাম তিন তলার রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু রান্না খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে হাটছে। খিদে সবারই পেয়েছিল। কিন্তু কাউকেই তেমন কিছু বললাম না পাছে আবার নিজেকেই স্পন্সর হতে হয়। তবে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। এসেছি যখন খেয়েই যাবো। কিন্তু চাদা তুলে। যেই ভাবা সেই কাজ। সবাই রেস্টুরেন্টের ভেতর ঢুকলাম। রেস্টুরেন্ট বলতে সাধারণত ধারণা করা হয় কড়া রান্নার গন্ধ, সেই সঙ্গে ঝাঝ, বেয়ারাদের হই চই কিংবা প্লেট- গ্লাসের টুংটাং আওয়াজ। এখানে তার কিছুই নেই। উল্টো পানির স্রোতের আওয়াজ!

অবাক ব্যাপার।

পুরো রেস্টুরেন্টটা একটা একুইরিয়াম দিয়ে ঘেরা। অর্থাৎ রেস্টুরেন্টের বাইরের দেয়ালটা কাচের এবং প্রায় পাচ ফিট দূরত্বের মধ্যে দ্বিতীয় দেয়ালটা। এর মাঝে পানি এবং তাতে সোনালি মাছ খেলা করছে। সত্যিই অদ্ভুতভাবে এরা এই জলজ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। আলো-আধারির এই অদ্ভুত সৌন্দর্য বন্ধুদের সঙ্গে খেয়ে পোষায় না। কেউ একজন থাকলে... তবেই না...।

খেয়ে-দেয়ে আরাম করে ঢেকুর তুলতে তুলতে বের হলাম। আরো অনেক কিছুই তখনো দেখার বাকি। মুভি শপ, ভ্যালেনটাইস কথিকা (যা তারা শুধু একবারই বিক্রি করে। যদি আপনার কাছে বিক্রি করে তবে তা আর কেউ জানবে না এবং সে কথিকা বা উক্তি আপনি আপনার প্রেমিকা কিংবা প্রেমিককে বলতে পারবেন), থিয়েটার ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। তবে সময় কিছু সংক্ষিপ্ত এবং খেয়ে কিছুটা ঢোল হওয়ার কারণে আস্তে আস্তে সবাই বেরিয়ে এলাম। বের হওয়ার সময় মনে হয় একটা প্ল্যান করেই ফেললাম। পরেরবার নিশ্চয়ই একা কিংবা বন্ধুদের নিয়ে আসবো না...।

লন্ডন থেকে

সংকট

– এস.এ. রহমান

জানি না সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস-এর ভালোবাসা সম্পর্কে যেসব মিথ প্রচলিত তার কোনটা সঠিক। তবে মিথ যেটাই সঠিক হোক না কেন, ভ্যালেন্টাইনসকে যে ভালোবাসার জন্যই প্রাণ দিতে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জানি না কোন সূত্রের গতি ধরে মানুষ প্রেমে পড়ে। অথবা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রেমের সীমাবদ্ধতা আছে কি না। তবে এটুকু অনুমান করতে পেরেছি যে, প্রেম-ভালোবাসা বয়সের মধ্যে

আবদ্ধ নেই। যেমন আমাদের আগের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সেনা কর্মকর্তা জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বর্তমানে আমাদের দেশে তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক বা রোমান্টিক পুরুষ। কারণ আটাত্তর বছর বয়সেও তিনি আটাশ বছরের বিদিশাকে প্রেম রসে সিক্ত করতে পেরেছেন এটা অনুমান করা কঠিন নয়। বিদিশার মুখ নিঃসৃত বাণীতে তা লক্ষ্য করা যায়।

এমনি এক এরশাদ মার্কা ভ্যালেন্টাইন সূত্রের প্রেমের সম্মুখীন হয়েছি আমি। এটা আমার জীবনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা হলেও বাস্তবতার নিরিখে খুবই কষ্টের।

আমি হাই স্কুলের একজন শিক্ষক। বয়স ছত্রিশ বছর। বিয়ে জীবনে দুই সন্তানের পিতা। স্কুলে অনেক মেয়ে আমার কাছে প্রাইভেট পড়ে। এমনি দুটি মেয়ে (দুই বোন) আমার কাছে ক্লাস সিক্স থেকে প্রাইভেট পড়তে থাকে। ২০০৩ সালে তারা দুই বোন এসএসসি পরীক্ষার্থী। ২০০২ সালে তারা যখন সদ্য টেনে ক্লাস ক্লাস করেছে তখন একদিন আমার কাছে এসে বললো, স্যার আপনার কাছে প্রাইভেট পড়বো।

উত্তরে বললাম, ঠিক আছে, কাল থেকে পড়ো।

দুই বোন সরলরেখা ও নওরিন প্রাইভেট পড়তে থাকে। পড়ানোর ফাকে ফাকে সরলরেখা আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি কোনো বিষয় বোঝাতে গেলে দেখতে পায় ও আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। প্রথম প্রথম মনে করতাম হয়তো এমনিতে ও রকম করছে। কিন্তু পরে দেখি পড়ার প্রতি ওর মনোযোগ কম। ও আমার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খুব ব্যস্ত।

এক দিন, দুই দিন এভাবে আস্তে আস্তে ব্যচের অন্য মেয়েদের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অন্য মেয়েরা একবার আমার দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু অন্য মেয়েদের বিষয়টা আমি বুঝতে দিই না। অন্য প্রসঙ্গ টেনে সহজ করি।

বিষয়টা পরিষ্কার হয় যখন ওকে একা পেয়ে বিষয়টা তুলি। ওর কথায় পরিষ্কার হই। ও যে আমাকে প্রচণ্ড ফিল করে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। আমার পারিবারিক সব কিছু জানার পরও ও আমাকে প্রচণ্ড ফিল করে এটা আমাকে ও স্পর্শ করে সংক্রামিত করে ফেলে। ওকে নিয়ে ভাবতে প্রচণ্ড আনন্দ অনুভব করি। ওর থেকে দূরে থাকলে প্রচুর কষ্ট পাই। এভাবে আনন্দ ও বেদনার মাঝে পবিত্রতা রক্ষা করে চলি। সকলকে উদ্দেশ্য করে কোনো কাজের কথা বললে ও আগে গিয়ে আমার কাজটি করে দেয়।

বিয়ে জীবনে ছাত্রীর সঙ্গে প্রেম করা! এটা জানাজানি হলে আমার জন্য সম্মান হানিকর। বিয়ে তো আরো গর্হিত কাজ। একদিকে সম্মান, অন্যদিকে প্রেম, আমাকে এখন হয় ভ্যালেন্টাইন সেজে প্রেমের গলায় দড়ি দিতে হয়, না হয় এরশাদ সেজে সম্মানের গলায় দড়ি দিতে হয়। তবে দুয়ের মাঝে খুব কষ্টে রাত যাপন করছি।

যশোর থেকে

জীবন নদী

তোমার ঠিকানা আমার জানা নেই। সংগ্রহ করলেও ওখানে চিঠি পাঠানোর সময় এবং পরিবেশ, পরিশেষে সাহসের অভাব। তাই আরো অনেক পাঠক ও লেখনির মাঝে তোমার জন্য আমার এ খোলা চিঠি।

সেদিন ছিল ঈদের দিন। আমাকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে প্রবাসী হলে। এতো কান্না এ জীবনে কারো জন্যে কাদিনি। এতো ভালোবাসা অন্য কাউকে বাসিনি। বিরহে বহ্নি হয়েছে ভালোবাসা। বহ্নিরা আগুনে ঝাপিয়ে পড়ে আর আমি জ্বলছি ভালোবাসার অনলে। আজন্ম জ্বলবো এতে সন্দেহ নেই। আজ তুমি কোথায় এবং আমি কোথায়। দুজনের উল্টো চলা। মুখোমুখি হবার সম্ভবনা নেই। জীবন–মৃত্যুর মতো আমাদের বিপরীত অবস্থান। সমাজ এবং সময় আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। আমি যাদের মাঝে আছি এরা আমার কাম্য ছিল না। আমি চেয়েছিলাম তোমাকে। পেলাম না। আমার ভাগ্যেই ছিলে না তুমি। পেলে কি এতো মোহ তোমার জন্য থাকতো? নাকি বিরহে প্রাণ পেয়েছে আমার ভালোবাসা?

তুমি চোখ তুলে চাইলে আমার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যেতো। তুমি হাত দিয়ে ছুলে আমার শিরায় শিরায় কাপন উঠতো। আর কেউ তাকালে আমি তাকাতে পারি না। কারো ছোয়া আমাকে ততোটা উদ্দীপ্ত করে না যেমন তোমার ছোয়ায় জেগে উঠতাম। তোমার জন্য কেদে কেদে আজো অশ্রু বানে ভাসি। আমার এ নীরব কান্না কেউ দেখে না। কেউ বোঝে না। তুমি তো না–ই। কতো নাম তোমাকে দিয়েছি। সে নামেই তোমাকে ডাকি চুপি চুপি।

স্বপ্নের রাজপুত্র তুমি ওই যুবকই আছো যাকে আমি হারিয়েছি।

সময় গড়িয়েছে। দুই যুগের মতো তোমাকে দেখিনি। সময় আজ হয়তো কেড়ে নিয়েছে আমাদের শরীরের সৌন্দর্য কিন্তু মনের বয়স তো বাড়লো না!

আমার প্রেরণা পুরুষ তোমার কাছে শিখেছি কথা বলা। তোমাকে দেখেছি অনন্য। তোমার হাসি, তোমার কথা বলা, তোমার চোখ জোড়া, তোমার দুই হাতের দশটি আঙুল, তোমার সব কিছুই আমার ভালো লাগতো। তুমি কোথায়? তোমাকে আর কোনোদিনই দেখতে পাবো না জানি। এ যে অসম্ভব। সমাজ সংসারের বাকা হাসির পাত্র হয়ে লাভ কি!

অনেক অনেক স্মৃতি। ওখানে তুমি একা আমার সঙ্গে অসম্ভব ভালোলাগা নিয়ে বিচরণ করো ঠিক যেন ফেলে আসা দিনের মতো। মনে পড়ে কি যখন তুমি আমাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে প্রথম চুমু একেছিলে আমার ঠোটে। বলেছিলে, ফেরত দাও একটা, তা না হলে বাহুমুক্ত করবো না। আমার কিশোরী মন তখন লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। কিছুতেই পারিনি সেদিন ফেরত দিতে একটি চুমু। তারপর আরো কতোবার তোমার সান্নিধ্যে গেছি। তবে ওই পর্যন্তই ছোয়াছুয়ি করেছি উষ্ণ হয়েছি, তোমার ওষ্ঠের ছোয়া নিয়েছি। এটুকুই, অপবিত্র হইনি।

ওই দিনের জন্য আজো গর্ব বোধ করি। কথা ছিল বিয়ের পর আর সব কিছু হবে। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে বা বাসর কোনোটাই হয়নি। আজ তুমি কোথায়? কেমন আছো তুমি? ভালোবাসতে শিখিয়েছো, সৌন্দর্য এনেছো আমার দেহ–মনে। অথচ এখন তুমি কোথায়? আমার অবুঝ মন তোমার জন্য আজো কাদে। কাদে আমার সময়। না পাবার ব্যথা সেই বুঝবে, যে পায়নি। যতো সুন্দর এই পৃথিবীকে মনে হতো ততো সুন্দর এই পৃথিবী নয়। যতো সুখ এখানে ছিল ততো সুখ এখানে নই। যাবার দিন কান্নার সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যাবার সময় আমার সব সুন্দর, সব ভালোবাসা তুমি হরণ করেছো। যেখানেই থাকো ভালো থেকো।

আজকে তোমার যারা পরিজন তাদেরও শুভ কামনা। কেননা তোমার আজকের আয়োজন। প্রয়োজন ওদেরকে ঘিরেই। আমার যারা পরিজন, আমার আজকের বসবাস যাদের সঙ্গে তারা। ঈর্ষণীয়, তবুও তুমি যে স্থান দখল করে আছো সেখানে এরা যেতেই পারেনি। কেননা কারো স্থান কেউ দখল করতে পারে না। তুমি কি পেরেছো আমকে মন থেকে মুছতে? জানানোর কোনো অবকাশ নেই।

আমার এ খোলা চিঠি যে তোমাকে লিখলাম তাও তোমার অজানা। ভালোবাসা দিবসেই শুধু নয়, তোমায় ততোদিন ভালোবেসে যাবো যতোদিন জীবন নদী বয়ে যাবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

অশেষ

– রলা

যখন প্রথম প্রেমে পড়েছিলাম তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্রী। কিন্তু তখন মনে হতো এই যার সঙ্গে প্রেম করছি তার সঙ্গে যদি বিয়ে না হয় তাহলে এক মুহূর্তও বাচাবো না। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! সেই আমার প্রেমিকটিই আমাকে ছেড়ে একটা অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে আজ সংসার করছে। অথচ আজও আমি বেচে আছি। আবার আগে আমার প্রেমিকটি যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতো তখন তার সঙ্গে আমার কথা বলতেই ইচ্ছা হতো না। অথচ আজ অন্য একটা মেয়ে তার বৌ, তার সন্তানের মা। আর আমি অন্য একজনের স্ত্রী এবং মা।

আসলে বিয়েই প্রেমের সমাপ্তি নয়। তারপরও প্রেমিক–প্রেমিকা বেচে থাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, আমার মতো অত্যন্ত জেদি একজন প্রতারিত প্রেমিকা এখনো বর্তমান সেই প্রেমিককে খুব ভালোবাসি। প্রতি সেকেন্ডে তার নাম আমার শ্বাস–প্রশ্বাসে প্রবাহিত হচ্ছে। কেন জানি, তাকে এক মুহূর্তের জন্যও ঘৃণা করতে পারি না।

তরুণ প্রেমিকাদের উদ্দেশ্যে বলি, প্রেমের কোনো শেষ নেই। আর প্রকৃত ভালোবাসা শুধু ভালোবাসাই, সেটা কখনো ঘৃণা করতে শেখায় না।

জামালপুর থেকে

পরিবর্তন

– তমালিকা চৌধুরী

১৯৯৪ সালে আমার বিয়ে হয় একজন ডাক্তারের সঙ্গে। ভালোবাসার বিয়ে নয়। বরং তার পেশা, চেহারা, বয়স সব মিলিয়ে তাকে আমার মনের মানুষটি মোটেও মনে হয়নি। নিষেধ করে দিলাম। কিন্তু পরিবারের বড়দের ওপর এ কথার কোনো প্রভাব পড়লো না। ফ্যামিলি ট্রাডিশন অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক করার পর আমার মতামত জানতে চাওয়া হলো এবং হ্যা কিংবা না–এর মূল্য না দিয়ে বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। রাগে, দুঃখে খুব কাদলাম। লাভ হলো না কিছুই।

খুব ভয় হতে লাগলো। সে কি আমার বন্ধু হতে পারবে, নাকি শুধু স্বামী হয়েই থাকবে? আমার ভাবনাগুলো কি সে বুঝবে অথবা বুঝতে চেষ্টা করবে? আমার পছন্দগুলো কি তার সঙ্গে মিলবে? পরিবারে সবার ছোট হওয়ায় আমার মাঝে কিছুটা আহ্লাদিপনা ছিল। তাই আরো ভয় করতো।

তাছাড়া এগারো বছরের বড় একজন মানুষের সঙ্গে মনের ও মতের মিল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ মনে হতো।

যেহেতু প্রথম থেকেই একটা নেগেটিভ ধারণা নিয়ে সংসারে প্রবেশ করলাম, তাই প্রথম থেকেই তার খুতগুলো চোখে পড়তে লাগলো। তার ব্যস্ততা দেখে মনে হতো স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব আছে, ভালোবাসা নয়। মাস খানেকের মধ্যেই মান–অভিমান, বিরক্তি প্রকাশ শুরু হয়ে গেল। ভয় হতে লাগলো, এখনই যদি এমন হয় পরে তাহলে কি অবস্থা হবে? ভবিষ্যতের ভালোবাসাবিহীন সংসার কল্পনা করে আতংকিত হলাম।

সব তরুণীর মতোই খুব রোমান্টিক ছিলাম। যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ানো, হাত ধরে হাটা, পহেলা বৈশাখ বা ভালোবাসা দিবসে কার্ড উপহার দেয়া, কতো ইচ্ছা যে করতো, কিন্তু তখন তার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রমের সময়। হয়তো সময় দিতে পারলো না কিংবা ভুলে গেল। খুব কষ্ট পেতাম।

সে বলতো, একটু সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি যেন বুঝতে চাইতাম না কিছু। মনে হতো কিছুই ঠিক হবে না। অন্য সাধারণ স্ত্রীদের মতো রান্না–বান্না ও বাচ্চা লালন করাই আমার কাজ হবে।

এক সময় সব কিভাবে যে বদলে গেল তা টেরই পেলাম না। আমার মাঝে পরিবর্তন এলো নাকি সে বদলে গেল বুঝতে পারলাম না। তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের সংসার এখন ভালোবাসার বিশাল সমুদ্র যে সমুদ্রে আছে শুধু জোয়ার, ভাটা নেই। এখন ভালোবাসা দিবস, পহেলা বৈশাখ অথবা জন্মদিনে কার্ড ও উপহার দিতে সে কখনো ভোলে না। উপহার হাতে নিয়ে লজ্জিত হাসি। সেও হাসে।

আমি তোমাকে ভালোবাসি এই চিরন্তন কথাটি আমরা কেউই বলি না। কিন্তু দুজনেই জানি, আমরা একজন আরেকজনের কাছে কতোটুকু। আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, বন্ধুত্বের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কানে বলে দেয় ভালোবাসি, ভালোবাসি।

উপশহর, সিলেট থেকে

অন্তর্ঘাত

– স্বপ্ন

দুপুরের খাবার খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে যখন ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছোট ভাইটা এসে বললো, ভাইয়া, ভাইয়া তোমার চিঠি এসেছে।

ঘুম ভেঙে গেল। চিঠিটা হাতে নিলাম। অপরিচিত হাতের লেখা। চিঠিটা খুলে পড়লাম।

তাতে লেখা, প্রিয় স্বপ্ন, আপনার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করতে চাই। ইতি, অনন্যা।

আর ছিল তার ঠিকানা।

বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দিলাম। কিছুদিন পর পেলাম আরেকটা হলুদ খাম। তাতে লেখা, আমার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চান। তারিখ, সময় ও রেস্টুরেন্টের নাম উল্লেখ করে আরো জানালেন, আমাকে তিনি চেনেন।

থ বনে গেলাম। কে হতে পারে? মনে হাজার প্রশ্ন উকিঝুকি দিতে লাগলো। তাছাড়া রেস্টুরেন্টে যাবো! কিছু টাকা খরচ হবে। ভাবনায় পড়ে গেলাম। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু এবং বাসায় বই কেনার কথা বলে আরো কিছু টাকা যোগাড় করে ফেললাম। তাতেই চলবে বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে *কিছুক্ষণ* রেস্টুরেন্টে হাজির হলাম। আধঘণ্টা দেরি করে অনন্যা এলো। দেখতে সুন্দরী। কথাবার্তা হলো। আপনি থেকে তুমিতে পৌছলাম। জানতে চাইলাম সে আগে থেকে আমাকে কি করে চিনতো?

এক অনুষ্ঠানে আমার কবিতা আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হয়েছে জানালো। তারপর তার পছন্দের খাবার এলো। কপাল ভালো। বিল আমার হিসাবের ভেতরেই ছিল, কম পড়েনি।

রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে পাশের এক পার্কে ঢুকলাম। একটা বেঞ্চ দখল করে বসলাম। তার হাত ধরে তাকিয়ে রইলাম মুখের পানে।

এমন করে কি দেখছো? জানতে চাইলো অনন্যা।

তোমাকে, তুমি খুব সুন্দর। চাদ, ওই ফুল সবই যেন হার মানে তোমার কাছে। তোমার সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ।

কি যে বলো, সুন্দর না ছাই। আচ্ছা, আমি সুন্দর না হলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না? প্রশ্ন করলো।

আসলে মনের সৌন্দর্যই বড় কথা। দৈহিক সৌন্দর্য ক্ষণিকের ভালোলাগা আর মনের সৌন্দর্য চিরকালীন ভালোলাগা। বললাম আমি।

বাহঃ চমৎকার বললে তো! কিছুক্ষণ হাসলো, তারপর বললো, আগামীকাল তোমার একটু সময় হবে?

তোমার জন্য একটু নয়, অনেকখানি সময় হবে। এবার বলো কখন?

সকাল দশটায় আমাদের বাসায় আসবে।

তোমাদের বাসায়! অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

ভয় করছো, আমি আছি না। বাসার সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো। যাকে আমি পছন্দ করি তাকে আমাদের পরিবারের সবাই পছন্দ করবে।

ঠিক আছে, মৃদ স্বরে সম্মতি জানালাম। তারপর আরো অনেকক্ষণ গল্প করে কাটালাম।

অনন্যার কথা মতো তাদের বাসায় গেলাম। সে খুব সুন্দর করে সেজেছে। আমি আসাতে খুবই খুশি হলো। বলো, কি খাবে। জানতে চাইলো অনন্যা।

যা তুমি খাওয়াবে। এই, তোমার আব্বু আম্মুর সঙ্গে পরিচয় কিরয়ে দেবে না?

এক গাল হেসে বললো, আব্বু তো অফিসে এবং আম্মু ছোট ভাইকে নিয়ে স্কুলে। বাসায় শুধু তুমি আর আমি। আগে তো আমার সঙ্গে ভালো করে পরিচয় হোক, তারপর অন্য কারো সঙ্গে পরিচয়। হেসে হেসে কথাগুলো বললো অনন্যা।

তোমার হাসিতে যেন মুক্তো ঝরে। যতো দেখছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। তুমি আমাকে কতোটুকু ভালোবাসো শুনি? জানতে চাইলো সে।

এ বুকে কান পেতে শোনো। তবেই বুঝবে তোমায় কতোখানি ভালোবাসি। বললাম আমি।

তাই নাকি? বলে আমার বুকে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলো। তারপর বললো, তা দেখছি অনেকখানি ভালোবেসে ফেলেছো। এবার আমার বুকে কান পেতে শোনো তো, আমি তোমার কতোখানি ভালোবাসি?

না, থাক, আপত্তি জানালাম।

কান পেতে শুনতেই হবে। তা না হলে রাগ করবো বলে অনন্যা বুকের ওপর থেকে ওড়না সরিয়ে ফেললো।

তখন আমি তার বুকে কান পাতলাম।

মুহূর্তের মধ্যে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

হারিয়ে গেলাম ভালোবাসার মাতাল স্রোতে।

সেদিন সন্ধ্যায় অনন্যা বাসায় টেলিফোন করে জানালো, তার বাবার খুব অসুখ। অপারেশন করাতে হবে। কিছু টাকা যোগাড় করেছে। এখনো আরো বিশ হাজার টাকা দরকার। সকাল নটায় সে *কিছুক্ষণ* রেস্টুরেন্টে অপেক্ষা করবে। যে করেই হোক টাকা যোগাড় করতে সে অনুরোধ করলো।

মহাচিন্তায় পড়ে গেলাম। কি করবো? এতো টাকা কোথায় পাবো? হাজার দুয়েক হলে না হয় যোগাড় করা যেতো। কিন্তু এতো টাকা! না, কিছু একটা করতেই হবে। তা না হলে যে তার কাছে ছোট হয়ে যাবো। অনেক ভেবে চিন্তে পরিশেষে তোশকের নিজ থেকে আলমারির চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে মায়ের স্বর্ণালংকার যা ছিল সব একটা প্যাকেটে ভরে নিলাম। সকালে ছুটে গেলাম রেস্টুরেন্টে। অনন্যা আগেই চলে এসেছে। তার হাতে প্যাকেটটা তুলে দিলাম।

খুলে দেখলো।

তুমি আমার খুব উপকার করেছো। তোমার এ ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না, আসি। বলে অনন্যা দ্রুত চলে গেল।

বাসায় ফিরে এসে দেখি আম্মু হাউমাউ করে কাদছেন। এতোদিনের সযত্নে জমানো স্বর্ণালংকার হারানোর কষ্টে তিনি পাগল প্রায়। চুপ চাপ পাথরের মতো দাড়িয়ে রইলাম।

বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, অনন্যার কোনো খোজখবর না পেয়ে তাদের বাসায় গেলাম। তার আম্মু জানালো, অনন্যা বাসায় নেই। বান্ধবীদের সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশ ভেঙে পড়লো আমার মাথায়।

ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম আপন ঠিকানায়।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা থেকে

আলফু

– মোহাম্মদ ককু মিয়া

গ্রামের ছেলে আলফু। পুরো নাম আলফাজউদ্দিন। কিন্তু কাউকে কোনোদিন এ নামে তাকে ডাকতে শোনা যায়নি। যাক সে কথা। আলফুর স্বপ্ন সে নামি ঘরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে। হোক সে

চিত্রনায়িকা শাবনূর কিংবা তাদের গ্রামের জমিদার কন্যা নূরজাহান। যোগ্যতা তার যাই হোক না কেন, সর্বোপরি সে তো একজন পুরুষ। তার চওড়া লোমশ বুক নিঃসন্দেহে যে কোনো নারীর কোমল, নিরাপদ, নির্মল রোমাঞ্চের ক্ষেত্র। তার উপরে গ্রামে তাদের তিন তিনটি জমি, পাচটি গরু ও একটি নৌকা আছে।

আলফু বাড়ির কাছের কোল্ড স্টোরেজে আলু বাছাইয়ের কাজ করে। বাবা জমিজমা দেখাশোনা করেন। সংসারে কোনো অভাবের ছোয়া নেই। অতএব স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়? সে কারণেই প্রতি রাতে সে তার কোলবালিশে শাবনূর থেকে ময়ূরী এক এক করে প্রত্যেককে ভর করে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে প্রেমলীলা চালায়। এক সময়ে তার একক রতিক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

মাঝে মধ্যেই তার মনে হয় সে যদি কোনো বড় রাজনৈতিক নেত্রীকে বিয়ে করতে পারতো! আহা রে! তাহলে হয়তো সারাটা জীবন পায়ের ওপর পা তুলে সবাইকে হুকুমের ওপর রেখে আনন্দপূর্ণ একটা জীবন উপভোগ করতে পারতো। পরক্ষণেই আবার এই ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, বিয়ে করলে তাকে হয়তো এখন কবরের বাসিন্দা হতে হতো। অথবা এই ভরা যৌবনে পাত্রহীন উনুনে শুকনো কাঠের মতো জ্বলেপুড়ে মরতে হতো।

নাহ! কোনো নেত্রীকে বিয়ে করা যাবে না। তারা ততোটা সেক্সি হয় না যতোটা ফিল্ম লাইনের মেয়েরা হয়। সিনেমা হলে শাবনূরের লাল পাপড়ি সদৃশ চোখ তাকে ব্যাকুল করে তোলে। আবার পর্বত উচু বক্ষধারিণী ময়ূরী যখন তার তিন নাম্বার বল সাইজের স্তন জোড়া ডিপজলের মুখের সামনে নাচায় কিংবা শর্টস পড়ে নাসরিন যখন ফাকা তালুর দিলদারকে জড়িয়ে গড়াগড়ি খায় তখন আলফুর পঞ্চইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে। লুঙ্গির নিচের ঘুমন্ত শিশ্নমুণ্ডুটা সাপের মতো ফুসে ওঠে। ছোবল মেরে দিলদারকে সরিয়ে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করতে চায়। হল থেকে বের হওয়ার সময় আঠালো জলে ছোপ ছোপ আলপনা ভরা লুঙ্গি নিয়ে বের হয় সে।

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল আলফুর দিনকাল। একদিন আলফু জানতে পারলো, আগামীকাল সকালে তাদের পাশের গ্রামে অমল পালের বাড়িতে শাবনূর অভিনীত নির্মাণাধীন একটা ছবির শুটিং হবে। সকালবেলায় আলফু খবরটা পেয়েছে। সেই থেকে তার মন ঘুড়িটা ফনফনিয়ে আকাশে-বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বিকেলে আলফু নদীর পাড়ে ছোট্ট মাঠে ঘাসের ওপর বসেছিল। তার পাশেই কয়েকটি স্কুল পড়ুয়া ছেলে শাবনূর-রিয়াজের রসালো প্রেম নিয়ে আপত্তিকর কথাবার্তা বলছিল। আলফুর তা সহ্য হয়নি। নীরবে সেই স্থান পরিত্যাগ করে বাড়িতে এসে একদলা থুথু ফেলেছে। ছেলেগুলোর বাড়িতে মা-বোন নেই নাকি! ভেবে পায় না আলফু।

পরদিন সকালে তাড়াহুড়ো করে নতুন শাদা শার্ট আর মাড় দেয়া লুঙ্গি পরে বের হয় আলফু। একি! অমল পালের বাড়িতে গায়ের লোকের হাট বসেছে কেন? ছবির শুটিংয়ের কথা এতো তাড়াতাড়ি এতো লোকে জানলো কিভাবে! আলফুর মাথায় নানান প্রশ্ন খেলা করে। আস্তে আস্তে আলফুও সেই হাটে মিশে যায়। কিন্তু নায়িকা কই? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। কাল সারা রাত আলফু ঘুমোতে পারেনি। যে করেই হোক আজ তাকে নায়িকার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। বলতে হবে এতোদিন ধরে মনের কোণে বেড়ে ওঠা ভালোবাসার কথা।

হঠাৎ করেই আলফুর চোখ প্রজাপতির মতো উড়ে গিয়ে নায়িকার ওপর পড়ে। আলফু উচ্ছ্বসিত হয়, আনন্দে টগবগিয়ে ওঠে। কিন্তু এখানে নায়িকাকে ছবির পর্দার চেয়ে কম সুন্দরী মনে হয়। তবুও আলফুর চোখ ঝলসে যাচ্ছে। নায়িকাকে পরিচালকের সঙ্গে কি যেন বলাবলি করতে দেখা যাচ্ছে। মানুষের মুখে মুখে আলফু শুনতে পেল, নায়িকা নাকি এতো লোকের গ্যাঞ্জাম থাকলে শুটিং করতে পারবে না।

যখনই সে নায়ককে জড়িয়ে ধরে ডায়ালগ বলতে যায় অমনি উপস্থিত দর্শককুল হই চই করে বাজে কমেন্টস করতে থাকে। এই বিশ্রি সিচুয়েশনে কোনো শর্ট দিতে পারবো না। পরিচালককে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন নায়িকা। বেচারা পরিচালক গ্রাম্য লোকজনকে মিষ্টি ভাষায় সহজ কথনে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। খুব সম্ভবত তিনি পুলিশের সাহায্য চাইছেন।

আ রে, আ রে, আহ! এমবে বাড়ি না দিলেও তো চলতো। ঘাড়ে পিঠে দুখানা ডাণ্ডার বাড়ি খাওয়ার পর আলফুর মর্মান্তিক উক্তি। এরপরে দ্রুত পায়ে আলফু শুটিং স্পট ত্যাগ করে। কারণ বাঘের মতো ধেয়ে ডাণ্ডা হাতে পুলিশ এগিয়ে আসছিল।

আলফু হাটে আর মনে মনে আউড়ায়, *হেই কিয়ের অভিনয় করে যে, হগলের সামনে পারে না। রূপের দেমাগ দেহাইনি। আমাগো গেরামের শেফালি হেরতন কম কিসে? শেফালির ডাবের লাহান দুধ দুইটার মইধ্যে ব্রেসিয়ার লাগাইয়া টাইট ফিট জামা ফিন্দাইয়া দিলে হেরতন বেশি উচা দেহা যাইবো। শেফালি ব্রাবিহীন সালোয়ার কামিজ পরে।*

আলফুর মতে তারপরও শেফালির ওই জিনিস দুইটা নাকি তার চোখে তীরের মতো বিধে। আলফু তার খালাতো ভাইয়ের কাছ থেকে এও শুনেছে যে, ঢাকাইয়া ওই সব নায়িকারা নাকি সাইজের চেয়ে ছোট টাইট ব্রেসিয়ার পরে নিজেদের বুকটাকে উচু করে রাখে। আর বদমাস ক্যামেরাম্যানরা ওই জায়গায় ফোকাস মেরে দর্শকের সামনে প্রদর্শন করে।

কাছে গিয়ে নায়িকাকে একটু ভালো করে পরখও করতে পারলো না আলফু। অথচ শেফালি তাকে কতো ভালোবাসে। এই তো সেদিন দুপুরবেলা আলফুকে ডেকে নিয়ে মুড়ি-চানাচুর খাওয়ালো। আলফুর সঙ্গে তার যখনই দেখা হয় তখনই চোখ পিলার স্থির করে তাকিয়ে থাকে। একদিন আলফু জিজ্ঞাসা করেছিল, অমন করে সে কি দেখে?

উত্তরে শেফালি বলেছিল, *তুমি মানুষটা বোকা, কিচ্ছু বোঝো না।*

আলফুর ভাবান্তর ঘটে। এসব দামি লোকদের পেছনে আর সে দৌড়াবে না। মাকে বলে এবার সে শেফালিকেই বিয়ে করবে।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

কোচিং

আমি তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। কতোই বা বয়স হবে। চোদ্দ বছর বয়স হবে হয়তো। বাড়ির কাছের এক কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। একটা ছেলে যাকে প্রথম দিন থেকেই খটকা লাগতো। আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমরা খুব ঘনিষ্ঠ দুই বান্ধবী ছিলাম। ওরা খুব ভালো দুই বন্ধু ছিল। ওরা দুজন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলো।

সে যাই হোক, কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলাম, আমাকে কিছু সে বলতে চাচ্ছে। কিন্তু লোক মুখে শুনলাম, সে আমাকে পছন্দ করে। এর মধ্যে আমাকে নিয়ে অন্য একটা ছেলের কাছে মারও খেয়েছে সে। তারপরও তার কথা শুনতে রাজি না। যাইহোক, প্রতিদিন কোচিং থেকে বেরিয়ে দেখি, দাড়িয়ে আছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো বাহানায় কিছু বলতে চাইতো। আমি শুনতে চাইতাম না। খুব ভয় লাগতো তার কথা শুনতে। তাকে দেখলেই হার্ট বিট বেড়ে যেতো। খুবই ভয় লাগতো।

একদিন ফোনে জিজ্ঞাসা করলো, আমার জবাব কি?

আমি কিছু না শুনেই না বলে দিলাম।

তারপরও সে দুটি কার্ড পাঠালো বাড়িতে। এরপর অতি কষ্টে তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম।

কিন্তু এখন এই চার বছর পরে এসে। তাকে খুব অনুভব করি। এখন মনে হয়, সে আমার পেছনে ঘুরলেই বোধহয় ভালো হতো। এতোদিন পর এসে এক বান্ধবীর কাছে শুনলাম সে এখানো আমার জন্য পাগল। যদি পাগলই হয়ে থাকে তবে ঘোরে না কেন? এখন এই ফার্স্ট ইয়ার, ড্যামকেয়ারে এসে তাকে যে খুবই দরকার।

এক পাগলি, যে তার ভালোবাসা হারিয়ে বুঝেছে সে কি হারিয়েছে?

নাম ও পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
খুলনা থেকে

বিষাক্ত

তখন আমি সবেমাত্র ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। আমাদের পাশের বাড়ির আমার দুই বছরের বড় এক চাচাতো ভাই আমাকে প্রেমের প্রস্তাব পাঠায়। প্রেমের সংজ্ঞা কি তখনো আমার কাছে ছিল অস্পষ্ট। কারণ বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে বিধায় সব সময় চোখে চোখে রাখা হতো। প্রতিবেশীরা তেমন ভালো ছিল না এ জন্য আব্বা মা মিশতেও বারণ করতেন। আর স্কুলেও ছিল না কোনো প্রিয় বন্ধু-বান্ধব। তাই ঘর এবং বাবা মা-ই ছিল আমার পৃথিবী। এ জন্য ওসব ব্যাপার সব সময়ই ছিল আমার পৃথিবী থেকে অনেক দূরের কোনো নক্ষত্র। তবে এটুকু মনে হতো, ওটা খুব খারাপ জিনিস।

ছেলেটি প্রথম যখন প্রস্তাব পাঠায় তখন খুব রেগে গিয়েছিলাম এবং সেদিন থেকেই তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আজও আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি।

আমার সব ইচ্ছা উপেক্ষা করে সে আমাকে একটি চিঠি দিয়েছিল। সেটা আমার হাতে না এসে পৌছালো আমার মায়ের হাতে। চিঠিতে কি লেখা ছিল জানি না। তবে চিঠি পড়ে আমাকে প্রচণ্ড নির্দয়ভাবে মা খুব করে কথা শুনিয়েছিলেন। বাবা যখন শুনলেন, তিনিও বললেন, সব দোষ নাকি আমার। আমি কোনো প্রশ্রয় না দিলে চিঠি দেয়ার সাহস পায় কি করে!

এসব শুনে আমার ছোট্ট মনটাতে বিরাট এক ঝড় বয়ে গিয়েছিল আর সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কোনোদিন ভালোবাসবো না কাউকে।

বরাবরই আমি ছিলাম মেধাবী। ক্লাস ফাইভ-এ ট্যালেন্ট পুল-এ বৃত্তি পেয়েছিলাম। এবং কোনো ক্লাসেই কোনোদিন দ্বিতীয় হইনি। ছোটবেলায়ই মনে মনে ভাবতাম, আমি অনেক বড় হবো। কিন্তু এই

ব্যাপারে বাবা যখন বললেন স্কুলে যাওয়া বন্ধ তখন মনে এক বিরাট ধাক্কা খেয়েছিলাম। মাথায় জেদ চেপেছিল বড় আমাকে হতেই হবে। আর সেটা সম্ভব একমাত্র পড়ালেখা করেই।

যাহোক, আমার স্কুলে যাওয়া কেউ বন্ধ করতে পারেনি। এখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির মর্যাদাপূর্ণ এক বিষয়ের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। শুধু ওই ছেলের কারণেই এসএসসি-র পর আমাকে গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল। এইচএসসি-তে ভর্তি হয়েছিলাম ঢাকার এক নামকরা মহিলা কলেজে। এখানে আমার আবাসন সমস্যার জন্য থাকতে হয়েছিল দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায়। তারপরও দমে যাইনি। রেজাল্টও পেয়েছি। সে আমাকে এখনো ভোলেনি। কিন্তু দূরে থাকার কারণে কিছুই করতে পারেনি।

ঘটনার এখানেই শুরু। সবাই বলে, আমি নাকি দেখতে পরিপূর্ণ সুন্দরী, স্মার্ট। হয়তো বা এ কারণেই আমি শো-বিজে ডাক পেয়েছিলাম।

এই সুন্দর মুখই বোধহয় আমার জন্য কাল হয়ে দাড়িয়েছে। সেই ক্লাস সেভেন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ছেলের ভালোবাসার কাঙ্ক্ষিত পাত্রী হিসেবে সেই ভালোবাসাবাসির কথা শুনতে শুনতে যখন আমি ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এমনি এক মুহূর্তে এক মানুষরূপী দানব আমাকে আমার সেই প্রতিজ্ঞা, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইছে। সে আমাদের ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রনেতার বড়ভাই। তবে তাকে যে আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

তাকে দেখলেই কথা বলা দূরে থাক, আমার শরীরের সব রোমকুপগুলো দাড়িয়ে যায়। পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যায়, মনে হয় যেন এক অন্ধকার অতল গহ্বরে আমি ডুবে যাচ্ছি। আমাকে বাচানোর বুঝি কেউ নেই পৃথিবীতে। একদিন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাতে দাত চেপে কোনো রকম বলতে পেরেছিলাম I hate you.

উত্তর দিয়েছিল, ইউনিভার্সিটিতে আসা বন্ধ করে দেবো। এমন শিক্ষা দেবো যে, কাউকে আর মুখ দেখাতে হবে না।

অসম্ভব এক কষ্ট, ভয় এবং চাপা কান্না নিয়ে ক্যাম্পাস ছেড়েছিলাম সেদিন।

তারপর থেকে শুরু হলো নতুন অত্যাচার। প্রতিদিন ক্লাস রুমের সামনে দাড়ানো, ক্যাম্পাসের যেখানেই যাই সব সময় ফলো করা, আত্মীয়দের বাসায় গেলে নিয়মিত ফোন করা। তবে শুরু থেকেই কেন জানি না তাকে একদমই সহ্য করতে পারি না। কতোদিন যে কতোজনকে দিয়ে বুঝিয়েছি, ফলাফল শূন্য। এই তো সেদিন এসে বলে প্রেম না করো কিন্তু কথা দিতে হবে আমাকেই বিয়ে করবে। ততোদিনে যেন ভুলে না যাও সে জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

বর্তমানের চরম অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে বলেছি, আমার যখন সময় হবে, পারিবারিকভাবেই আপনাকে বিয়ে করবো। কিন্তু সে পর্যন্ত কোনো যোগাযোগের চিন্তা করবেন না। এ অভিনয় আমাকে করতে হয়েছে। কারণ কিছুদিন যেন অন্তত শান্তিতে থাকতে পারি। এতো কিছুর পরও আমি ভালো নেই। কারণ সে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সে যেভাবে আমার পিছু নিয়েছে তাতে কোনোভাবেই আমাকে ছেড়ে দেবে না। সত্যিই হয়তো আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করবে। আর সেদিনই ঘটবে আমার জীবনের চরম পরিণতি। সেদিন হয়তো বা আপনাদেরই কারো চোখে পড়বে ছোট্ট একটি শিরোনাম, অকালেই ঝরে গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্রী। করুণ আর্তনাদে ফেটে যাবে আমার বাবা মায়ের বুক। নিমেষেই চূর্ণ

হবে তাদের স্বপ্ন, সাধগুলো। এখন আমি কি করবো? কোনো দরকার আছে কি এই অসম্ভব বিষাক্ত ভালোবাসার?

নাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

লেখিকা ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য করবো।

–যাযাদি

ইরিয়ানা

– আনোয়ার সাদাত শিমুল

ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে তখন আমার শেষ সেমিস্টার। থিসিস পেপার জমা দিয়েছি। এক সেমিস্টার পরে কনভোকেশন। পড়ালেখার চাপ তেমন ছিল না। একটি সুপারমার্কেটে পার্টটাইম কাজ করি। সময় বেশ ভালোই কাটছিল। মনের ভেতর অন্য রকম উত্তেজনা আর কয়েক মাস পরেই দেশে ফিরে যাবো একেবারে। আহ! আমার দেশ, বাংলাদেশ। ভাবতেই অন্য রকম।

হঠাৎ একদিন বাসায় ফোন করেন ড. মারি স্পিজেল। আমার প্রিয় শিক্ষকদের অন্যতম। তিনি আমাকে বেশ ভালো জানতেন, স্নেহও করতেন। স্যার বললেন, পরদিন বিকেলে তার অফিসে যেতে।

যথাসময়ে গেলাম। দেখি স্যারের রুমে একটি মেয়ে বসে আছে।

স্যার পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাম ইরিয়ানা ফ্যালকন। ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ওই সেমিস্টারে সে স্যারের কাছে ইকনমিক্স কোর্স করছিল। স্ট্রং ম্যাথস ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকায় সে ক্লাস লেকচার তেমন ক্যাচ করতে পারছিল না। স্পিজেল স্যারও তাকে সময় দিতে পারছিলেন না নানান কারণে। অবশেষে স্যার দায়িত্ব দিলেন আমার ওপর। কিছুটা কাচুমাচু করে রাজি হলাম। স্যার সাহস দিলেন। বললেন, ডোন্ট ওয়ারি অমিত। ইউ উইল বি পেইড অফ।

আমি মুচকি হাসলাম। ইরিয়ানাও আমাকে থ্যাংকস জানালো।

অবসর সময়ে ইরিয়ানা–কে ভালোই পড়াচ্ছিলাম। কৃশ্চিয়ান ইরিয়ানা–র পূর্বপুরুষ ছিল ইজিপশিয়ান। তার দাদা কানাডা–য় এমিগ্রেট করেন অনেক আগেই। পড়ালেখার বাইরে আমি আর ইরিয়ানা নানান বিষয়ে ভাবনা শেয়ার করতাম। দেশ–কাল–অর্থনীতি কিছুই বাদ যেতো না। বাংলাদেশের সোশাল স্ট্রাকচার নিয়ে ইরিয়ানার আগ্রহ ছিল সাংঘাতিক। আমিও যথাসম্ভব তাকে জানাতে চেষ্টা করতাম।

এক উইকএন্ডে ইরিয়ানা প্রস্তাব দিল পাশের একটা পিকনিক স্পটে যেতে। রাজি হলাম। সেদিন ইরিয়ানা নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। আমরা যেখানে গিয়ে থামলাম সেটা খুবই সুন্দর, গোছানো আর পরিকল্পিত জায়গা। চার বছর কানাডায় থাকলেও সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। ইরিয়ানা আর আমি একটা বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসলাম পাশাপাশি।

ইরিয়ানা আমার কাধে মাথা রেখে বললো, অমিত, ইউ আর রিয়ালি এ নাইস পারসন।

বললাম, ইরিয়ানা, তুমি কি জানো আমাদের দেশের অধিকাংশ তরুণ–তরুণী এখনো ইচ্ছা করলে প্রকাশ্যে প্রিয় কারো কাধে মাথা রাখতে পারে না যেমনটা তুমি করছো?

চমকে উঠে সে বললো, কেন?

সোশাল স্ট্রাকচার। আমি বললাম।

তার মানে কি তোমাদের দেশে অপজিট সেক্সের প্রতি কারো ভালোবাসা নেই? আকর্ষণ কিংবা পারস্পরিক মেলামেশাও নেই?

হাসলাম। বললাম, থাকবে না কেন? আছে। তবে সেটা এখানকার মতো নয়। সে ভালোবাসা অন্য রকম। গভীর, হৃদয়স্পর্শী।

তুমি কি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারো? ইরিয়ানা বললো।

বললাম, তুমি বরং কাল আমার বাসায় এসো। আমার কাছে কিছু বই আছে। তোমাকে পড়ে শোনাবো। তাহলে বুঝবে আমাদের দেশে ভালোবাসা কেমন।

ইরিয়ানা সায় দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে ইরিয়ানা এলো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যায়যায়দিন *ভালোবাসা* সংখ্যা বের করলাম। বেছে বেছে বারোটা গল্পের সারাংশ অনুবাদ করে শোনালাম। আমি পড়ছিলাম আর ইরিয়ানা মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে রাতে আমরা দুজন একত্রে ডিনার করলাম। কিন্তু এরপরই হঠাৎ সে ফোস ফোস করে কাদতে শুরু করলো। আমি অবাক হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তাকে নানান প্রশ্ন করলাম।

জবাব পেলাম না। অবশেষে সে সরি দ্যাটস ওকে বলে বিদায় নিল।

হতবাক হয়ে তার চলে যাওয়া দেখলাম।

ঘণ্টা খানেক পর ফোন বাজলো। ইরিয়ানার কল। হ্যালো বলেই সে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলো। আর কথা বলে না।

আমি এপাশ থেকে হ্যালো হ্যালো বলেই যাচ্ছি।

হ্যালো, ইরিয়ানা হ্যালো! হোয়াট হ্যাপেন্ড? আর ইউ ওকে?

অমিত, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ। প্লিজ ডোন্ট রিফিউজ মি! প্লিজ! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইরিয়ানা ধীরে ধীরে বললো।

এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরে কথা বলবো। পরশু তোমার ফাইনাল পরীক্ষা। এখন পড়ালেখা করো। বলে ফোনটা ছাড়লাম।

বিছানায় শুতে এলাম। অথচ বার বার ইরিয়ানার কথা মনে পড়লো। গত আড়াই মাসে তার সঙ্গে আমার যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে, তাকে অস্বীকার করতে পারছিলাম না কোনোভাবে। কেবল নিজের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুজছিলাম। এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্নও দেখলাম আবোল-তাবোল।

পরের কয়েকদিন ইরিয়ানার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আমিও ব্যস্ত ছিলাম। ওই সপ্তাহেই আমার কনভোকেশন। কনভোকেশনের দিন সকালে রেডি হচ্ছিলাম। কলিংবেলের শব্দে দরজা খুলে দেখি ইরিয়ানা। হাতে অনেকগুলো ফুল।

ফুলগুলো রেখেই সে আমার হাত ধরে বললো – ইয়াহু, আই গট অ্যান ‘এ’।

আমার খুব ভালো লাগছিল। ইরিয়ানা ইকনমিক্স কোর্সে 'এ' গ্রেড পেয়েছে। নিজের পরিশ্রমকে সার্থক মনে হচ্ছিল। কনভোকেশন প্রোগ্রামে গেলাম ইরিয়ানার গাড়ি চড়ে। সে আমার অনেকগুলো ছবি তুললো। সে রাতে আমাদের কনভোকেশন ডিনারে ইরিয়ানা অ্যাটেন্ড করলো আমার গেস্ট হিসেবে।

পরদিন ইরিয়ানা আমার বাসায় এলো। আবারও একই প্রসঙ্গ তুললো। সে আমাকে বিয়ে করতে চায়।

নানানভাবে তাকে আমাদের দেশের সোশাল স্ট্রাকচারের কথা বোঝালাম। বললাম বাবা-মায়ের কথা যাদের মতের বাইরে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

ইরিয়ানা এসব শুনে খুব কাদলো। শেষে তাকে কথা দিলাম। দেশে বাবা-মাকে যেভাবেই হোক রাজি করাবো। তারপর ইরিয়ানা-কে বাংলাদেশে নিয়ে বিয়ে করবো।

এ কথা শুনে সে চোখ মুছলো। অবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরে আমার ভালো লাগছিল।

বাংলাদেশে ফেরার দিন ইরিয়ানা আমার ব্যাগ, ল্যাগেজ সব গুছিয়ে দিল। এর মাঝে তার চোখ ভিজে উঠছিল। সে আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিল, যতো দ্রুত পারি তাকে যাতে বাংলাদেশে নেয়ার ব্যবস্থা করি। আর প্রতিদিন একবার করে ই-মেইল। সম্ভব হলে ফোন।

আমিও রাজি হলাম।

এয়ারপোর্টে ইরিয়ানা ছাড়া ড. স্পিজেলও এসেছিলেন। প্লেনে ওঠার পর ইরিয়ানার জন্য অন্য রকম খারাপ লাগছিল।

দেশে ফিরে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার মাঝে এমনভাবে ডুব দিলাম যে, ইরিয়ানার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম। তাছাড়া আমাদের মফস্বল শহরে তখনো ইন্টারনেট নেই। ফোনে কয়েকবার চেষ্টা করেও ইরিয়ানাকে পাইনি। এদিকে বাবা-মা আমার বিয়ের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। প্রতিদিন নতুন নতুন পাত্রীর খবর আনছেন। তাদের এ উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝে ইরিয়ানার প্রসঙ্গ তুলতে সাহসই পেলাম না। সার্বিক পরিবেশ আমাকে বাধা দিচ্ছিল। তাই নীরব থাকলাম।

মাস তিনেকের মধ্যে বিয়েও করলাম। ভালো চাকরি পেয়ে তিথিসহ ঢাকায় চলে এলাম।

তিথি আমার বৌ যার স্পর্শ ছাড়া ঘুমাতে পারি না, ঘুম থেকে উঠতে পারি না, খেতে পারি না, এমনকি গোসল করে মাথাটাও মুছতে পারি না। তিথির ভালোবাসার ও বাস্তবতা আমার স্মৃতি থেকে ইরিয়ানাকে মুছে দিচ্ছিল ক্রমেই। কানাডায় ইরিয়ানা আমার জন্য অপেক্ষা করছে আর আমি এখানে...। একটা অপরাধ বোধ সব সময় আমাকে তাড়া করে। বিবেকের দংশনে কুকড়ে যাই। নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না। তবুও প্রতিটি রোমান্টিক সন্ধ্যায় তিথির হাতে হাত রেখে বলি - ভালোবাসি, ভালোবাসি। হয়তো এরই নাম জীবন!

গত মাসে তিথির কোল জুড়ে এসেছে একটি ফুটফুটে কন্যা শিশু। আমাদের প্রথম সন্তান। এখনো নাম রাখিনি। তিথি বলছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখবে সিথি বা মিথি। আর আমি মনে মনে আমি ভাবছি অন্য কিছু। তার নাম রাখবো ইরিয়ানা।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

গুণতির বাইরে

– ইব্রাহীম খান

তাকে খুব ভালোবাসতাম। একদিন তাকে না দেখলে থাকতে পারতাম না। একদিন তার কাছে না গেলে, তার গায়ে হাত না বোলালে অস্থির হয়ে উঠতাম। যেখানে যেতাম, যতো দূরেই যেতাম তার কথা মনে করতাম। কোথাও গেলে ফিরে এসে দেখি সে ঠায় দাড়িয়ে আমার আশায় প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। তার কাছে দাড়ানো মাত্র আমার মন–প্রাণ এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে যেতো।

সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়। তবু তার সঙ্গে আমার একটা অসম বিজাতীয় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে কথা বলতে পারতো না, শুধু ইশারায় আমাকে কাছে ডাকতো। কাছে গেলে তার দেহের প্রশান্তি দিয়ে, নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের স্নিগ্ধতা দিয়ে, উপস্থিতির কমনীয়তা দিয়ে আমাকে স্বর্গীয় সুখ দিতো। সে ঠায় দাড়িয়ে থাকতো। তার গায়ে যখন হাত বোলাতাম তখন সে নীরবে আমার স্পর্শ সুখ অনুভব করতো। আমার হৃদয়ের ভালোবাসার রসে সে সিক্ত হতো। তার সান্নিধ্যে গেলে আমার হৃদয়–মন শীতল হতো। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে দেহমন ভরে যেতো। কোনো কারণে আমার মন খারাপ হলে, দুঃখ–বেদনায় জর্জরিত হলে তার পাশে গিয়ে দাড়াতাম। আমি পরম শান্তি পেতাম।

সে ছিল আমার বাড়ির উঠানের প্রিয় নিম গাছ।

জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে ওখানে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তার শাখা–প্রশাখা ছিল আমার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হররোজ তার ডালে উঠে বসে থাকতাম। স্কুলে যাবার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে এসে তার সঙ্গসুখ আমার চাই–ই চাই। কতোদিন মায়ের বকা খেয়ে তার ডালে উঠে তাকে আমার মনের কথা অকপটে বলেছি। তার চিকন–চাকন ডালে উঠে দোলনার মতো দোল খেয়েছি। তার মোটা ডালে দোলনা বেধে দুলেছি। মনে পড়ে, একবার কোনো কারণে মায়ের ওপর অভিমান করে, রাতের বেলা ঘোড়ার মতো তার একটা শাখায় বসে, আরেক শাখায় কেদারার মতো হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক জায়গায় খোজাখুজি করে মা অবশেষে ওখান থেকে আমাকে আবিষ্কার করেছিলেন। পাড়ায় রটে গিয়েছিল আমাকে জিনে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল। সেই সুবাদে পাড়ার সোলেমানের মা তো সোলেমানের কামলা রোগের ওষুধ নিতেই আমার কাছে এসেছিল। সে কথা মনে হলে এখন খুব হাসি পায়।

বসন্তে কচি কচি পাতায় তার ডালপালা ভরে যেতো। তখন তাকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। গ্রীষ্মের দাবদাহে অতিষ্ঠ হয়ে তার তলায় গিয়ে খাটিয়া পেতে শুয়ে থাকতাম। সে আমাকে তার শাখা–প্রশাখা দুলিয়ে ঘুম পাড়াতো।

তার ফল মানুষের অখাদ্য। কিন্তু পক্ষীকুলের প্রিয় খাদ্য। যখন তার ফল পাকতো, হরেক রকমের পাখ–পাখালি এসে জুটতো তার ডালপালায়। বসন্তে এসে জুটতো কোকিল। পঞ্চম স্বরে গান গাইতো, মানুষকে উতলা করে তুলতো। প্রতিদিন সকালে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি এসে তার শাখায়–প্রশাখায় বসতো, সপ্তম সুরে গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙাতো।

একদিন বড় হলাম, স্কুল–কলেজে পড়লাম, চাকরিতে ঢুকলাম। তবুও প্রতিদিন অন্তত একবার করে তার সঙ্গসুখে তৃপ্ত হতাম।

পাড়ার লোকেরা প্রতিদিন তার কচি ডাল ভেঙে দাত মাজতো। সনাতন কাকা প্রতিদিন সকালে ওর পাতা নিয়ে গিয়ে পাটাতে বেটে রস পান করতো। বাদেশ কবিরাজ তার পাতা দিয়ে ওষুধ বানাতো, পাড়ার কারো পাচড়া হলে তার পাতা সিদ্ধ করে ঘা ধুয়ে দিলে উপশম পেতো। হাসান চাচার একবার মধুমেহ হয়েছিল। তার পাতা ভাজি করে খেয়ে খেয়ে চাচার নিরাময় হয়েছিল। তার অঙ্গচ্ছেদ বা পত্রচ্ছেদ হলে আমি দুঃখ পেতাম। কিন্তু কোনোদিন তার কোথাও মালিন্যের ছাপ দেখিনি, বরং দ্বিগুণ পত্র পল্লবেও আরো সুশোভিত হয়েছে। পরোপকার করাই বোধহয় তার ব্রত ছিল।

এলো ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর। দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী লোকালয়ে ঘটলো মহাপ্রলয়। তার করাল গ্রাসে সব কিছু তছনছ হয়ে গেল। আমাদের এলাকাও তার মরণ ছোবল থেকে রক্ষা পেল না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল আমার প্রাণপ্রিয় নিম গাছ। এক পাশের শেকড়গুলো উপড়ে গেল, অন্য পাশেরগুলো ঠিকই থাকলো। মা–ভাই তাকে কেটে ফেলতে চাইলো। আমি কাটতে দিলাম না। তার কিছু কিছু ডালপালা ছেটে দেয়া হলো। সে লাঠি ভর করে কোনো রকমে কষ্টে বেচে রইলো। তবুও তার কাছে গেলে এক অব্যক্ত সুখ পেতাম, পেতাম চির অভ্যস্ত আরাম।

এলো ১৯৭১ সাল। হানাদার বাহিনী পাড়ার প্রাইমারি স্কুলে তাবু গাড়লো। একদিন তাদের কুদৃষ্টিতে পড়লো আমার আবাল্য সঙ্গী নিম গাছটি। তারা নির্মমভাবে কুড়াল দিয়ে তাকে কাটলো, লাকড়ি বানালো, চুলোর ভেতর তার কর্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে তাদের খানা পাকালো, তাদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি করলো। আমি কাপুরুষের মতো নীরবে সব দেখলাম। দুঃখ পেলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পেলাম না।

লাল লাখ মানুষের আত্মত্যাগে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। আমার প্রাণপ্রিয় আশৈশব সঙ্গিণী নিম গাছটি এ গুণতির বাইরে রয়ে গেল।

সপুরা, রাজশাহী থেকে

ভালোলাগা

– ফেরদৌসী সাকলায়েন পুন্নি

প্রথমে ভালোলাগা, তারপর ভালোবাসা। মনে হয়েছে ভালোবাসার বুঝি কোনো প্রকারভেদ বা পরিমাপ নেই। সময় ভেদে এটি আমাদের জীবনে কখনো আনন্দ আবার কখনো বেদনা বয়ে এনেছে। তাই তো এলোমেলো কিছু ভালোলাগাকে, আনন্দ আর বেদনায় ভরে এবারের ফাল্গুনে ভালোবাসা সংখ্যায় পাঠালাম।

Liebe dich, Love you, ভালোবাসি শব্দগুলো একত্রে বলে আমাদের বার্লিন–এ বসবাসকারী ছোট শিশু তাসিদা। তার আধো আধো মিষ্টি কথামালার মধ্যে ভালোবাসায় শব্দগুলো আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

বাইরে বের হলেই একটি মজার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে আর তা হলো, পথ চলা দুটি শিশু যদি একে অপরকে কোনোভাবে দেখতে পায় তাহলে থমকে দাড়িয়ে পড়ে এবং পরস্পর পরস্পরকে কিছু সময়

দেখে নেয়, এর মধ্যে নিজেরা আবার বিড় বিড় করে কি সব বলে, ধীরে ধীরে দুজন দুজনের দিকে এগিয়ে যায়, তারা প্রায় ক্ষেত্রেই নাকের সঙ্গে নাক লাগিয়ে আলিঙ্গন করে এরপর দুজন দুজনকে দেখতে দেখতে তাদের বাবা মাকে ফলো করতে শুরু করে।

এমনটি অবশ্য লক্ষ্য করেছি এ দেশের কুকুরগুলোর মধ্যেও কারণ কুকুরগুলোও অত্যন্ত অর্গানাইজড ওয়েতে শিশুদের আদরেই লালিত পালিত হচ্ছে এই আধুনিক সমাজে। আমরাও এখন এই সমস্ত সভ্য ভদ্র কুকুরগুলোর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আলোচনা করি। মনে হয় এদের প্রেমেও কিছুটা পড়ে যাচ্ছি।

ঘরে কিছু পুষতে মন চাইছিল, সব দিক ভেবে সিদ্ধান্ত হয়েছে গোল্ডফিশ আনা হবে এবং এগুলো নাকি ঘরে শান্তিও বয়ে আনে। এগুলো আবার সুন্দর এবং শান্ত প্রাণী। বছর চারেক আগের কেনা গোল্ডফিশগুলো এখন অনেক বড় বড়। মাঝে মধ্যে ঘনিষ্ঠজনেরা জোক করে যে, গোল্ডফিশগুলো তো বেশ বড় হয়েছে এগুলোর কিছু একটা ব্যবস্থা হোক। এই সামান্য জোক শুনেই আমার মেয়েকে শান্ত করতে খুব বেগ হয়।

মেয়ের এই অবুঝ কান্না সামাল দিতে গিয়ে আমার নিজের ছোটবেলার একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমার এক চাচাতো বোনের খুব শখ ছিল হাস মুরগি পোষা। একবার ভীষণ জেদ ধরে ওর কাছ থেকে একটা ছোট হাসের বাচ্চা পুষতে এনেছিলাম। হাসের বাচ্চাটি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করে ওকে বেশি করে খেতে দিতাম। বেশি খাবার পায় বলে, বাচ্চাটি আমাকে দেখলেই থপ থপ করে আমার কাছে আসতো আর আমার গর্ব হতো বাচ্চাটি আমাকে চেনে বলে। ধীরে ধীরে ও বড় হয়ে ওর গায়ের রঙ খয়েরি হচ্ছিল পাখা দুটিও বাড়ছিল।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে ওকে আর খুজে পাইনি। ভীষণ কেদেছিলাম, পরে জেনেছিলাম, আমাদের অতি চেনা কেউ একজন হাসের বাচ্চাটি ধরে নিয়ে গেছে, ওই সময় মনে হয়েছিল, বুঝি আমার সমস্ত ভালোবাসা ওই পোষা হাসের বাচ্চাটির জন্য ছিল। মাঝে মধ্যে ভাবি, মানুষের ছোট ছোট ভালোবাসাগুলো যে কখন কার জন্য সে মনে হয় নিজেও জানে না। যেমনটি ছিল ফেলে আসা জীবনের কিছু স্মৃতি।

ছুটির দিনের দুপুরের খাবার আমরা ভাইবোনসহ সব সময় একত্রে আব্বার সঙ্গে খেতাম। ইলিশ মাছ বা মুরগি রান্না হলেই বাবাকে দেখতাম ইলিশের ডিম এবং মুরগির কলিজা ভেঙে ভেঙে আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন। মরসুমি ফলগুলোও আব্বা একই কায়দায় আমাদেরকে নিজে বসে খাওয়াতেন, এতে বাবার হাতের ছোয়া থাকতো বলেই হয়তো আজ তার গভীর ভালোবাসা প্রকটভাবে অনুভব করছি।

এখানেও প্রতি শনিবার বাংলাদেশি দোকানগুলোতে দেশের মাছ, সবজি, ফল-মূল কেনার হিড়িক পড়ে যায়। সঙ্গে অনেকে আবার বাংলা কথা শোনার জন্য ঢাকার নাটক খোজ করেন। কেউ কেউ আবার বিভিন্ন ধরনের বাংলা পত্রিকার খোজ করেন। তাতেও যে দেশের গন্ধ এবং ছোয়া লেগে আছে এতো এক অদ্ভুত ভালোবাসা। কেউ কেউ আবার নিজের গ্রাম, নিজের বাড়ি, আত্মীয়-স্বজন সব ভিডিও করে এনে তা দেখে এবং নিজের কাছে রেখে এক ধরনের শান্তি পেতে চেষ্টা করে। কারণ প্রিয়জনদের সব সময় দেখতে না পেলেও তো মাঝে মধ্যে ভিডিও বের করে দেখা যায়। যা দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতোই।

যখন এই মানুষটিই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে সময় এই প্রবাসে আর কাছের কাউকেই শেষবারের মতো দেখে যেতে পারে না। তখন সেটা হয় সত্যিই বেদনার। বাংলাদেশি কেউ মৃত্যুবরণ করলে, দীর্ঘ ফর্মালিটিজের পর তার মৃত্যুদেহ কফিনে করে মালপত্রের সঙ্গে দেশে পাঠানো হয়। অনেক সময় তার মুখটি হয়তো ভালোভাবে প্রিয়জনেরা আর দেখতেও পায় না। তাকে সেই কফিনের মধ্যেই কবরে চলে যেতে হয়, শুধুই পড়ে থাকে তার ভালো কাজগুলোর স্মৃতি চিহ্ন। একমাত্র মানুষই পারে তার লোভ, লালসা, ঈর্ষা, ঘৃণা সব মুছে ফেলে পৃথিবীকে সুন্দর করতে। এবং একে অপরের কল্যাণ কামনাই হওয়া উচিত ভালোবাসার চূড়ান্ত রূপ।

তাই তো আবারও মনে পড়ছে ছোট তাসিদার ভাঙা ভাঙা শব্দগুলো Liebe dich, Love you. ভালোবাসি এটিই সবার কাম্য হওয়া উচিত।

জার্মানী থেকে

মনস্তাপ

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস আগের ঘটনা। রোজ সকালে প্রাইভেট পড়তে যেতে হতো। শীতের সকালেও মুক্তি নেই। একে তো শীত তার উপর রিকশাচালকের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করার ঝক্কি। এমনিতেই সকালে রিকশা পাওয়া যায় না। আর পেলেও ডাবল ভাড়া চায়। অসহ্য! অথচ স্যার কিছুতেই সময় চেঞ্জ করবেন না। কেননা তিনি কোরআন শরীফ পড়তে রোজ সকালে উঠতেন এবং কোরআন পড়া শেষ করে আমাদেরকে পড়াতেন।

বাসা দূরে ছিল বলে আমার আর আমার বান্ধবীর প্রাইভেটে যেতে রোজ দেরি হতো। উপায় না দেখে, অনেক দেখেশুনে একটা ভদ্রগোছের এবং যুবক শ্রেণীর রিকশাচালককে ঠিক করলাম। সে প্রতিদিন আমাদেরকে প্রাইভেটে নিয়ে যেতো এবং নিয়ে আসতো। প্রতিদিন আমরা তার সঙ্গে গল্প করতাম। গল্পে গল্পেই জানলাম সে নাকি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছিল। কিন্তু টাকার অভাবে আর পড়া হয়নি। কোনো কাজ না পাওয়ায় রিকশা চালাতে হচ্ছে। তার আছেই শুধু মা। কিন্তু তিনি গ্রামের বাড়িতে থাকেন।

একটা সহানুভূতি তৈরি হলো বেচারা রিকশাচালকের প্রতি। এই সহানুভূতিই যে একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে তখনো বুঝিনি। রোজ গল্প করতে করতে প্রাইভেটে যেতাম এবং আসতাম। এভাবেই চলছিল। একটা সময় খেয়াল করলাম আমার বাড়ির গেটে সামনেই সে থাকে বেশির ভাগ সময়। শুধু আমাকে দেখলেই সে রিকশা নিয়ে এগিয়ে আসে। আমিও ব্যাপারটা খুব উপভোগ করতাম। আগে থেকেই রিকশায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক ছিল আমার। তাই একদিন বাবা–মায়ের সঙ্গে খুব রাগারাগি করে বাড়ি থেকে বের হয়ে ঠিক করলাম রিকশায় চড়ে যতোক্ষণ ইচ্ছা ঘুড়ে বেড়াবো। ওই রিকশাচালকের রিকশাতেই চড়লাম।

ঘোরাঘুরির প্ল্যান বাদ দিয়ে হঠাৎই ঠিক করলাম, রিকশাচালকটা কোথায় থাকে দেখা যাক। তাকে বলতেই সে একটা খুপরি ঘরের সামনে রিকশা থামালো। বুঝলাম এটাই তার ঘর। ঘরে ঢুকলাম। কিছুক্ষণ থাকলাম। কেন জানি খুব ভালো লাগলো। এরপর থেকে প্রায়ই তার ঘরে যেতাম। সে

আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। কারণ আমি খুব না হলেও মোটামুটি সুন্দরী। আমার খুব মজা লাগতো।

ততোদিনে আমরা পরস্পরের প্রেমে পড়ে গেছি।

একদিন সন্ধ্যায় তার খুপরিতে গেলাম। কথা বলতে বলতেই খেয়াল করলাম সে কেমন জানি একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি কাছে ডাকতেই সম্মোহিতের মতো এগিয়ে এলো। সে আমার কাছে আসতেই চোখ বুঝলাম। আমার উরুতে হাত রাখলো রিকশাচালক। আমার সারা শরীর শির শির করে উঠলো। তারপর...। আমার অসম্ভব ভালো লাগছিল। কেমন জানি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোর ভাঙতে সময় লাগলো না। কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। বুঝতে পারছিলাম কাজটা ঠিক করছি না। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। ওই রিকশাচালকের স্পর্শ পাওয়ার জন্য আমার সারা শরীর মন আকুল হয়ে থাকতো।

নোট-এর অজুহাতে এ বান্ধবী, সে বান্ধবীর নামে রোজ যেতাম তার কাছে। কিন্তু পরীক্ষা এগিয়ে আসায় বাড়ি থেকে বের হতে পারতাম না। ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠতাম। কোনো মতে পরীক্ষা পার করলাম। মায়ের সঙ্গে খালা, মামার বাসায় বেড়াতে যেতে হলো। কিন্তু কোথাও ভালো লাগছিল না। বাসায় ফিরতেই দেখলাম গেটের কাছে এখনো দাড়িয়ে আছে আমার প্রেমিক রিকশাচালক। আদরে আদরে আমাকে আবার ভরিয়ে তুললো সে।

কিন্তু আমার মা একদিন কড়া আপত্তি জানালেন রোজ রোজ আমার বাইরে যাওয়া নিয়ে। তিনি হয়তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন। কেননা একদিন বাড়ি ফিরে শুনি আমার বিয়ে একজন ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে। আমি হতবাক! কি করবো, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার বিয়ে হয়ে গেল।

আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। এ জন্যই নিজেকে খুব বেশি অপবিত্র লাগে, ভণ্ড মনে হয় নিজেকে। যতো দিন যায় আমি বুঝতে পারি কি ভয়ানক পাপ করেছি। নিজের প্রতি ঘৃণা এখনো আমাকে পাগল করে তোলে, একটা ভয় সব সময় আমাকে তাড়া করে।

বিয়ের পর একদিন স্বামীর সঙ্গে লং ড্রাইভে বের হলাম। গাড়ির কাচ খোলা ছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি সেই রিকশাচালক। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাচ তুলে দিলাম।

আমার হাজব্যান্ড আজও জানে না। সেদিন আমার গা রি রি করে উঠেছিল ঠিকই তবে ওই ছোট জাত রিকশাচালককে দেখে নয়, সতীর অন্তরালের এই অসতী নারী দেহটার দিকে তাকিয়ে! আজ বিয়ের কয়েক বছর পরে ভয় হতে মুক্তি পেয়েছি ঠিকই কিন্তু মনস্তাপ থেকে মুক্তি পাইনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

অমলিন

থানা সদর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরের এক নিভৃত পল্লিতে আমাদের বাস। গ্রামে তখন রাস্তাঘাট বা বিদ্যুৎ কোনোটাই ছিল না। এ গ্রামেরই এক প্রাইমারি স্কুলে চাকরি নিয়ে আসে শহরের মহিলা নিরা। এসেই সমস্যায় পড়ে থাকার। আমার পিতা যিনি ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি গ্রামেই একটি বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রুচিশীল নিরার সেখানকার পরিবেশ পছন্দ না হওয়ায় সেদিনই লাগেজ রেখে চলে আসেন আমাদের বাড়িতে এবং জানিয়ে দেন এখানে ছাড়া কোথাও থাকবেন না তিনি। এদিন থেকে আমাদের বাড়িতে তার থাকা শুরু এবং অল্প সময়েই সে সবার মন জয় করে নিল। সময়টা ছিল নব্বইয়ের মাঝামাঝি। আমি তখন গ্রামের স্কুলের ক্লাস টেন–এর ছাত্র। আমার পড়া শেষে প্রায় প্রতি রাতেই তিনি আমার রুমে এসে গল্প করতেন। এতে তার নীরস, নিঃসঙ্গ সময়ের কিছুটা হলে কেটে যেতো। কিন্তু গল্প করে সময় কাটানো বেশি দিন চলতে পারলো না। কথায় আছে, *নেই কাজ তো খৈ ভাজ।* হলোও তাই।
গ্রামের মানুষেরা সন্ধ্যার পরে কাজ না থাকার কাজের কাজ হিসেবে তারা আমারও নিরাকে জড়িয়ে এক নোংরা কানাকানিতে লিপ্ত হলো। অথচ আমার চেয়ে নিরা ছয় সাত বছরের বড় এবং তখন তার দুই তিন বছরের একটি সন্তানও রয়েছে। এই সমালোচনা আমাদের কান পর্যন্ত পৌছালো এবং সম্মান বাচাতে বন্ধ করে দিলাম আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তা। কথা বলার প্রয়োজন হলে আমরা রাতের নিস্তব্ধতা বেছে নিতাম। বাধা থাকায় তখন কথাগুলো আরো বেশি মমত্বপূর্ণ হতো।
ইতিমধ্যে আমার এসএসসি পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা কেন্দ্র আমার স্কুল থেকে কেটে গেল থানা সদরে। নিরার বাসা থানা সদরে হওয়ায় সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। পরীক্ষা চলাকালে বেশি সময় ছুটি নিয়ে আমার খোজখবর রাখতো। সে আমাকে প্রচণ্ড আদর–যত্ন করতো যাতে কোনো কৃত্রিমতা এবং অস্বাভাবিকতা ছিল না। কিন্তু পরীক্ষা শেষে হঠাৎ একদিন নজরুলের *শিউলিমালা* গল্পের *চোখে ধূলিকণা ঢুকলে যদি এতো যন্ত্রণা হয় তাহলে চোখে যার চোখ পড়ে তার বেদনা বুঝি অনুভূতির বাইরে* এ লাইনটি দেখিয়ে বললো, এটা বোঝো?
সেদিন তার চোখে মুখে বিরাট অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করলাম। পরীক্ষা শেষে ফিরে গেলাম গ্রামে। হাতে অফুরন্ত সময়। কিন্তু নিরার সঙ্গে দিনে কথা হতো খুবই কম। মানুষের চোখ এড়াতে গভীর রাতে পাশাপাশি বসে গল্প করতাম। কখনো সে চলে যেতে তার সোনালি অতীতে। এভাবে চলতে চলতে দুজনের মধ্যে ভালোলাগার অনুভূতি জন্ম নিল। বেড়ে যেতে থাকলো কথা বলার সময়। সময়ের ব্যবধানে মনের অজান্তেই আমার আর নিরার মাঝে সৃষ্টি হলো গভীর ভালোবাসার। এটা কেন হলো বলতে পারবো না। তবে অযাচিত সন্দেহই হয়তো আমাদের এদিকে তাড়িত করেছিল। আমাদের এ সম্পর্ককে সবাই পরকীয়া বলবে। তবে আমি তা বলবো না। কেননা পরকীয়া মানেই শারীরিক প্রেম। আমাদের মাঝে তা কখনোই ছিল না।
গভীর রাতে হাতে হাত রেখে যখন ভালোবাসার কথা বলতাম তখন সীমাহীন এক ভালোলাগায় মন ভরে যেতো। এ সম্পর্ক হওয়ার আগে আমার হৃদয় ছিল ছায়াহীন। নিরাই প্রথম আমার হৃদয়ে ছায়া ফেললো যা পরবর্তী কালে কষ্টি পাথরের মূর্তি হয়ে আসন করে নিল আমার হৃদয় বেদিতে।
রেজাল্ট হয়ে গেল। গ্রাম ছেড়ে ভর্তি হলাম শহরের কলেজে। এর কিছুদিন পর নিরাও বদলি হয়ে চলে এলো নিজের এলাকায়। কালক্রমে নিরার সঙ্গে যোগাযোগ কমতে কমতে বন্ধ হয়ে গেল এক সময়। কিন্তু নিরার স্মৃতিকে একটি দিনের জন্যও মুছে ফেলতে পারিনি মন থেকে। কলেজ পেরিয়ে চলে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে এবং সময়ের ব্যবধানে সেখানকার সর্বোচ্চ ডিগ্রিটাও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে আমি এখন অনেকটা বিকশিত মানুষ।

একে তো সকল ক্ষেত্রে ভালো রেজাল্ট, তার উপর খোদার দান চেহারাটাও বরাবর সুন্দর। সব মিলিয়ে অনেকেই আজ ঘনিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু নিতে পারি না কাউকেই। কেননা আমার হৃদয় কেবল তার স্মৃতিতেই পূর্ণ। যখনই কেউ ভালোবেসে কাছে বসে বা হাতে হাত রাখে তখন মনে হয়, আমার সেই নিরাই যেন পরম মমতায় হাত বোলাচ্ছে।

জীবনের প্রয়োজনে নিরা আর আমি আজ দুই প্রান্তে। সে তার চাকরি, স্বামী–সন্তান নিয়ে ব্যস্ত আর আমি ব্যস্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজে। এখন বছরে দুই একবারও তার সঙ্গে দেখা হয় না। কিন্তু এমন মাস যায় না যার দুই চার দিন নিরাকে ভেবে আমার নির্ঘুম কাটে না। অথচ সে আমাকে মনে রেখেছে কি না তাও জানি না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা বা নিরার সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি কারণে তাকে জানাতেও পারিনি। প্রেমের যে দীপ সে আমার মনে জ্বালিয়েছিল তা আজও অমলিন রয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা থেকে

আত্মবিশ্বাস

– জন

আমরা দুজন এক সঙ্গে থাকি বা না থাকি প্রতিটি দিনই কাটে আমাদের ভালোবাসার পরশে। কিছুদিন আগে এটা এক বিশালতায় প্রকাশ পেয়েছিল। আমার টুই প্রচণ্ড দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। কোনো কিছুর ওপরই তার তেমন আস্থা নেই। সে পত্রিকা খুব কমই পড়ে। এবং লেখার ব্যাপারে তো কোনো আস্থাই নেই। তবুও যাযাদির *শাড়ি* সংখ্যার লেখা আহবানে সেও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু পর পর তিনটি সংখ্যায় সে নিরাশ এবং হতাশ হয়ে আরো আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল। যার জন্য সে মানসিক চাপ অনুভব করছিল। তার ওপর *খাড়ার ঘা* হয়ে দেখা দিল আমার অনুপস্থিতি।

পরীক্ষার জন্য *শাড়ি* চতুর্থ পর্ব প্রকাশের সময় ছিলাম খুলনায় এবং সে ঢাকায়। সে আরো ক্ষেপে ছিল। কেননা অক্টোবরেই আমাদের দুজনের জন্মদিন। অবস্থানগত কারণে এবার আমাদের দেখা হবে না এটা সে মানতেই পারছিল না যা গত পাচ বছর হয়নি। কিন্তু আমি তো নিরুপায়। এ জন্যে সে আমার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বন্ধই করে দিল। এতে নাকি কষ্ট বাড়বে। যাক, সব ভুলে বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হতেই সময় পার হতে লাগলো। তার জন্মদিনের আগের দিন বের হলাম তার জন্য একটা শাড়ি কিনবো বলে। ঘুরেফিরে একটা শাড়ি এবং যাযাদি–র শাড়ি শেষ পর্ব কিনে ফিরে এলাম বাসায়।

রাত বারোটায় শুভেচ্ছা জানাবো বলে মোবাইলে কল করলাম। কিন্তু একি? ফোন তো বন্ধ। বার বার চেষ্টার পরও একই ফলাফল, দিস মোবাইল ক্যান নট বি রিচড এট দি মোমেন্ট। পরে বসে বসে শাড়ি সংখ্যা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখি তার লেখাটা ছাপা হয়েছে। উত্তেজনায় আমার ঘুম চলে গেল। আবারও চেষ্টা করে বিফল হলাম ফোনে। তাই এক বুক কষ্ট আর উত্তেজনা নিয়ে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম। হঠাৎ ফোনের শব্দে আমার তন্দ্রাভাব দৌড়ে পালালো।

ফোনে শুধু একটা কথাই ভেসে এলো, আমি চলে এসেছি।

উদভ্রান্তের মতো দৌড়ালাম বাসস্ট্যান্ডে। গিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। এখন আমার হাসবো, না কাদবো অবস্থা। তারপর তাকে নিয়ে বসলাম *বনবিলাস* পার্কে। তার উপহার শাড়িটা দিলাম তাকে।

পেয়ে খুশি হয়ে ফিশফিশিয়ে শুধু বললো, ভালোবাসি খু-উ-ব।

পরে যাযাদির সংখ্যাটা তার হাতে দিয়ে বললাম, তোমার লেখাটাও ছাপা হয়েছে।

অবিশ্বাসী চোখে পাতা উল্টিয়ে এক নিঃশ্বাসে চোখ বুলিয়ে চিৎকার করে বললো, হ্যা, আমার লেখাই তো!

তারপর...?

তারপর আর কিছুই না, আমার কাধে মাথা রেখে বসেছিল অনেকক্ষণ। যখন মাথা তুললো তখন দেখলাম আমার শার্ট ভিজে গেছে তার চোখের পানিতে। এই চোখের পানি কিসের? আনন্দের, না কষ্টের? একটা আস্থাহীন মেয়ে তার আস্থা আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে সেদিন।

ধন্যবাদ যাযাদি, আমার টুই-এর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার জন্য।

ঢাকা থেকে

স্বার্থপর প্রেমিকা

আমি ভালোবাসতাম আমার ফুপাতো বোন নীলুকে। নীলু আমার দেয়া নাম। নীলু আমার থেকে তিন চার বছরের ছোট। আমরা একই ঘরে একই স্থানে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। খেলার সঙ্গী থেকে আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে শুরু করি। নীলু ছিল অপরূপ রূপের অধিকারী। বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে। আমরা খেলাধুলার ফাকে ফাকে গল্প করতে ভালোবাসতাম। অনেক সময় গল্প করতে করতে নীলুকে জড়িয়ে ধরতাম। তখন আমার কি যে ভালো লাগতো! সে ভালো লাগার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

এভাবে চলতে চলতে আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতাম। নীলুর গায়ের গন্ধ শুকতাম। নীলুর গালে নাক লাগাতাম। তারপর ঠোটে চুমু খেতাম। নীলু কিছুই বলতো না। নীলুর নীরবতায় আমি আরো বেপরোয়া হয়ে যেতাম। আমার শরীরে এক অজানা শিহরণ জাগতো। এর আগে এমন কখনো হয়নি। নীলুর মুখ থেকে আমার মুখ কেবলই নিচের দিকে চলে যেতো। তার নরম কচি স্তন দুটোর ওপর মুখ রেখে চাপ দিতে থাকতাম। মাঝে মধ্যে হাত চালিয়ে তার স্তন দুটোতে চাপতে থাকতাম। অনেক দিন তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম। সে চোখের আড়াল হলে খারাপ লাগতো।

ফুপা নর্থ বেঙ্গলে সরকারি চাকরি করতেন। বছরে এক দুই মাস বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসতেন। ছুটি কাটিয়ে যাওয়ার সময় প্রথম প্রথম দুই চার দিন মন খারাপ লাগতো। যখন থেকে চুমু খাওয়া ও স্তনে হাত চালানো শুরু করেছি তখন থেকে নীলুর চলে গেলে খুবই খারাপ লাগতো। তারপর শুরু হলো চিঠি দেয়া-নেয়া।

জীবনে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। ছাত্র হিসেবেও মোটামুটি ভালো ছিলাম। কোনো অবস্থাতেই লেখাপড়ায় মন বসাতে পারতাম না। কেবলই নীলুর চিঠির অপেক্ষায় থাকতাম। কখন এক বছর পর ওই দিনটি আসবে যখন নীলুরা বাড়ি আসবে। পড়তে বসলেই নীলুর মুখ বইয়ের পাতায় ভেসে

উঠতো গত স্মৃতি কখন তার সঙ্গে কি করেছি। মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া না করার কারণে পর পর দুইটি পরীক্ষারই কোনো প্রকারে পাস করলাম। ডাক্তারি আর পড়া হলো না। বিএসসি দ্বিতীয় বিভাগে পাস করলাম। ফুপা স্ট্রোকে মারা গেলেন। পরিবারের সকলে একেবারে গ্রামে চলে এলো। এদিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে।

১৯৭১ সাল। আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে চাইতাম। আমার মায়ের একই কথা, আমাকে মাটি দিয়ে তবে তুমি মুক্তিযুদ্ধে যেও।

আমার বাবা নেই। কোনো ভাইও নেই। বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ের ধারণা, মুক্তিযুদ্ধে গেলে যদি মরে যাই। মায়ের শেষ সম্বল আমি। আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা। পাক বাহিনী রাস্তার পাশের বাড়িতে ক্যাম্প করেছে। গ্রাম নিরাপদ নয় আমাদের মতো তরুণদের জন্য। সমস্ত গ্রামের মানুষ নিরাপদ স্থনে চলে যায়। নিজের বাড়িঘর চলে রেখে। আমরা তিন পরিবার চলে গেলাম নিরাপদ গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি।

আমাদের তিন পরিবারের মধ্যে নীলুরাও ছিল। কোনো কাজকর্ম ছিল না। সারাদিন নীলুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতাম। আমরা একটা বড় ঘরে রাতে অনেকেই শুতাম। নীলু এবং আমিও ওই ঘরে থাকতাম। রাতে ঘরের বাতি নেভালেই চুপি চুপি নীলুর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। নীলুও আমার জন্য অপেক্ষা করতো। অন্ধকারে একজোড়া প্রেমিক–প্রেমিকার প্রেমলীলা।

আসল কাজটি বাকি রেখে বাকি সবই করতাম। এভাবে রাতের পর রাত।

মাঝে মধ্যে বিশেষ উত্তেজনায় নিজেকে সামাল দিতে পারতাম না। নীলুর সমুদ্রে গোসল করতে চাইতাম। সে আমাকে কতো সুন্দরভাবে বুঝাতো ওয়াও ওয়াও এসে যায় যদি। তাছাড়া তোমাকে তো আমি সবই দিতেছি। শুধু এ কাজটি বিয়ের পরের জন্য রেখে দাও লক্ষ্মীটি।

আমি কোনোদিন দেহ ভোগে বিশ্বাসী ছিলাম না। কোনোদিনই তার ওপর জোর খাটাইনি। নিশ্চিত ছিলাম আমরা একে অপরকে বিয়ে করবো। এরই মাঝে দেশ স্বাধীন হয়েছে। নীলু এবার বিএ পরীক্ষা দেবে। আমি চাকরির জন্য চেষ্টা করছি। মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট ছাড়া তখন চাকরি হতো না। মাকে অনেক আঘাত দিয়েছি তখন মুক্তিযুদ্ধে যেতে দেয়নি বলে। আমার মা আর বেচে নেই এখন। নীলুকে আমার মা অনেক স্নেহ করতেন। কিন্তু ছেলের বৌ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হতেন না। আমার মায়ের ধারণা ছিল, ছোট পরিবারে ছেলেকে বিয়ে করালে পরিবার ছোট হবে। ছেলেকে বড় পরিবারে বিয়ে করালে বেশি ছেলেমেয়ে হবে।

আমার কিছু আত্মীয় নীলুদের জমি চাষ করতেন। তাদের ধারণা, আমার সঙ্গে নীলুর বিয়ে হলে নীলুদের জমিজমা সব আমার আয়ত্বে এসে যাবে। তখন তারা আর নীলুর জমি চাষ করতে পারবে না। নীলুর সম্পত্তির লোভে নানান জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। আমার ফুপুর খুব ইচ্ছা ছিল নীলুকে আমার কাছে বিয়ে দেয়ার। আমার ওই স্বার্থান্বেষী আত্মীয়রা ফুপুকে উল্টোসিধে কথা বলেছেন। ফুপু সরাসরি আমার মায়ের কাছে না এসে দূরের আত্মীয়দের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলেছেন। নীলুর জন্য অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসছে। কিন্তু কোনোটাই সব দিক দিয়ে মিলছে না।

একদিন শুনলাম ঢাকায় স্বায়ত্তশাসিত এক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে নীলুর বিয়ে প্রায় ঠিক হচ্ছে। সব দিক দিয়ে উভয়ের পছন্দ হয়েছে। জানতে পেরেই ছুটে গেলাম নীলুর কাছে। নীলু, আমি একি শুনছি, তোমার নাকি বিয়ে প্রায় ঠিক। তোমার মতেই কি এ বিয়ে হচ্ছে?

উত্তরে সে বলেছিল, অভিভাবকরা পছন্দ করেছেন। আমার মতের কি দাম আছে?

তবুও তুমি বিএ পরীক্ষার্থী, তোমার মতামত না নিয়ে তোমার অভিভাবকরা পাকা কথা দেবেন না। তুমি কি আমাকে ছাড়া অন্যত্র বিয়ে হলে সুখী হবে? আমাকে ভুলে যেতে পারবে? তাহলে কি তুমি এতোদিন ছলনা করে এসেছিলে? আমার জীবনটা নষ্ট করে তুমি সুখী হতে পারবে না। ফিরিয়ে দাও আমার ছাত্র জীবন। আমি কতো উচ্চাশা পোষণ করতাম। তোমাকে নিয়ে কতো কিই না কল্পনা করতাম। আমি তোমাকে ছাড়া বাচবো না। আমার সব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমি কথা বলবো।

মায়ের সঙ্গে কোনোদিনই নীলুর বিয়ের ব্যাপারে কথা আমার হয়নি।

নীলুকে বললাম, মাকে আমি রাজি করাবোই।

নীলু উত্তরে বলে, সে সময় শেষ হয়ে গেছে।

চলো আমরা কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলি।

নীলু বলে, আত্মীয়স্বজনের মুখে চুনকালি দিতে পারবো না।

কোনোভাবেই রাজি করাতে পারি না। শেষে এক পর্যায়ে নীলুর গলা টিপে ধরি। সে ঘাবড়ে যায়। চোখ মুখ দেখে বুঝলাম খুব ভয় পেয়েছে। শেষে বললাম, আমি জোর করে তোমাকে নিয়ে আসবো। উত্তরে সে বলে, তখন তুমি আমাকে পাবে না, পাবে আমার লাশ।

আমি পাগলের মতো চলে আসি। কি করবো ভেবে পাই না। আত্মীয়স্বজনকে ধরে কি হবে, স্বয়ং নীলুই রাজি হচ্ছে না। তারপরও নীলুর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। সে আমাকে ছাড়া বিয়ে করবে না। হয়তো নিন্দুকদের কথায় কিছুটা বিগড়ে গেছে।

তারপর একদিন শুনলাম নীলুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পরেই বৌকে ঢাকার বাসায় নিয়ে যাবে। আমার বিশ্বাসই দিচ্ছিল না। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সবাই জানতো আমাদের প্রেমের কথা। সবাই নিশ্চিত ছিল আমাদের বিয়ে হবেই। যখন বিয়ে ঠিক হয়ে গেল তখন লজ্জায়, দুঃখে বাড়ি থেকে চলে যাই। এরপর অপেক্ষায় ছিলাম হয়তো চূড়ান্ত পর্যায়ে নীলু বেকে বসবে। তখন হয়তো অভিভাবকরা আমাকে খুজবে। আমার কাছে খবর পৌছে বিয়ে হওয়ার। খবর শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। খাওয়া-দাওয়া, ঘুম কিছুই ভালো লাগে না। ঠিক ওই মুহূর্তে মানুষ চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিলাম। এতো বড় আঘাত পেলাম। এতো বড় কষ্ট, ভাষা নেই প্রকাশ করার। আমার বেকারত্ব এর জন্য দায়ী। নীলু নিজের সুখ নিজেই বেছে নিয়েছে।

কয়েকদিন পর বাড়ি থেকে খবর পেলাম একটা গুজব ছড়াচ্ছে। আমি নাকি নিখোজ হয়ে গেছি। মা আমার পাগল প্রায়। বাড়ি গেলাম। আমাকে দেখে মা শান্ত হলেন। দুটা বছর কিছুই করিনি। চাকরি না পেয়ে ব্যবসা শুরু করলাম। ব্যবসাতে মন বসাতে পারিনি। একটা ছাড়ছি, আরেকটা ধরছি। আমাকে বিয়ে করানোর জন্য আত্মীয়স্বজনদের ধরাধরি করছেন মা। আমি বিয়ে করবো না বলে দিই। মায়ের কান্নাকাটিতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজি হলাম।

নীলুর বিয়ের পাচ বছর পর বিয়ে করলাম। আমার স্ত্রী আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে থাকি। আস্তে আস্তে নানানজনের কাছ থেকে আমার স্ত্রী জানতে পারে নীলুর সঙ্গে আমার প্রেমের কথা। আমি দেখলাম সত্য কোনোদিন চাপা থাকে না, একদিন না একদিন প্রকাশ পাবেই। আমার প্রেমের দশ বছরের প্রতিটি ঘটনা বিস্তারিত আমি বলেছি। আমার স্ত্রীর ধারণা, একবার প্রেম করলে তার মাঝে আর প্রেম থাকে না।

আমার উদাসীনতার কারণে ব্যবসা করতে পারলাম না। পর পর দুইটি এনজিওতে চাকরি করেছি। তাতে সুবিধা করতে পারিনি। এরই মাঝে আমি তিন সন্তানের জনক। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার স্ত্রীর প্রেরণায় আমি এখন প্রবাসী। আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পারিনি। তবে সংসার খরচ চলে। ওই দিকে নীলুর আশা পূর্ণ হয়েছে। তার স্বামীর গাড়ি-বাড়ি, ব্যাংক ব্যালান্স সবই হয়েছে। কিন্তু মনের দিক দিয়ে কতোটুকু সুখী হয়েছে জানি না। তার ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে।

আমার স্ত্রীর সামান্য ব্যাপারে আমার সঙ্গে মনোমালিন্য হলেই সে আমাকে খোটা দিয়ে থাকে। যেমন, আমি লোভী। নীলুর সম্পত্তির জন্য তাকে ভালোবাসতাম। নীলু আমাকে ভালোবাসতো না। আমাকে নীলু বডিগার্ড হিসেবে ব্যবহার করতো যাতে করে অন্য ছেলেরা তাকে বিরক্ত করতে সাহস না পায়।

একদিন আমার স্ত্রী বললো, তুমি তো সবই করেছো। আসল কাজটা বাকি রাখলে কেন? ওই কাজটা করলেই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতো।

তখন আমার মনে পড়লো সেই আপ্তবাক্যটি, *চামড়ার নলই হলো সকল প্রেমের উৎস।* নীলুর সঙ্গে দেখা হয় দেশে গেলেই।

কোনোদিনই লোভী ছিলাম না। যখন আমার স্ত্রী আমাকে লোভী অপবাদ দেয় তখন খুবই দুঃখ পাই। নীলুর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন ভুলে যাই বর্তমানকে। অতীতকে ভুলতে চাই। কিন্তু অতীত আমাকে ভুলতে দেয় না।

আমি না-ইবা সুখী হলাম, নীলু সুখী হোক এই কামনা করি। মাঝে মধ্যে ভাবি, নীলু হয়তো একদিন সব কিছু ফেলে চলে আসবে আমার কাছে চিরদিনের জন্য। যদিও তা কখনো সম্ভব নয় তবুও কেন তা ভাবী। আমি যতোদিন বাচবো ততোদিন পর্যন্ত ভুলতে পারবো না আমার বাল্যপ্রেমের স্মৃতি।

পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
সউদি আরব থেকে

কার্ড

- বাবুনী

আমার আব্বু সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী হওয়ার কারণে আমাকে প্রায় দুই তিন বছর পর পরই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে হতো। তখন আমি কলেজে উঠেছি মাত্র। হঠাৎ করেই আমার এক কাজিনের প্রেমিককে কিছু ইনফর্মেশন দিতে গিয়ে দেখি তার প্রেমিক ওখানে নেই। সে ভাটিয়ারী ছেড়ে যশোরে চলে গেছে। আমি রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। ফলে বাম

পাশে আমার ঠিকানা ছিল। প্রায় তিন মাস পরে একটা চিঠি পেলাম, সঙ্গে একটা কার্ড। ভাষাটা এ রকম ছিল – *আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো খুব। আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি। এমনিতেই এদিনে লিখলাম কিছু মনে করবেন না।*

তখনো ১৪ ফেব্রুয়ারি নিয়ে এতো মাতামাতি রকমের কিছু হতো না ছোট বিভাগীয় শহরগুলোতে। অনেকবার কার্ডটা দেখলাম, নাড়াচাড়া করলাম। ভেতর থেকে কি যেন একটা ভালোলাগা কাজ করছিল। ঠিক এমন সময় আরেকটা কার্ড পেলাম। তাতেও দুই তিনটা সেন্টেন্স ছিল আগেরটার মতোই অনেকটা। আরেকটু ভালোলাগা শুরু হলো। জীবনের প্রথম ভালোবাসা দিবসের দিনে কার্ড পাওয়ার মজাই আলাদা। আমি চুপ। শুধু কার্ড দুটো দেখি আর ভাবি। সব সময় আমার পড়ার ড্রয়ারে থাকতো। নিজেকে বোঝাই, বাবুনী, এতো তাড়াতাড়ি তোমার নিজেকে উন্মোচন করো না।

অনেক দিন চুপ করে আছি। এই ভাবি চিঠি আসবে, কার্ড আসবে। অপেক্ষার আর শেষ হয় না। কার্ড বা চিঠি পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে পড়াশোনায় মন দেয়ার চেষ্টা করলাম। তবু ক্ষীণ আশাটা রয়েই গেল। পড়াশোনার চাপে ওই ক্ষীণ আশাটাও ছেড়ে দিলাম।

হঠাৎই পরের বছর ১৪ ফেব্রুয়ারিতে আবার একরাশ আশ্চর্য নিয়ে কার্ড পেলাম। সঙ্গে একটা চিনামাটির পরী। তাতে লেখা – *তোমার জন্য।*

খুব ভালো লাগলো। দারুণ ভালোলাগায় কয়েকদিন বুদ হয়ে পড়ে রইলাম।

পুরো এক বছর কোনো খবর নেই। ভাবলাম, পরের বছর হয়তো পাবো। প্রায় তিন বছর হতে চললো ভাবি না আর এসব নিয়ে। অনার্স থার্ড ইয়ারে পড়ছি। লোকজনের মাঝে খুজি, মনে মনে খুজি, কোনো শহরে গেলে খুজি। হঠাৎ ২০০১–এর ১৪ ফেব্রুয়ারিতে একটা ঠিকানাসহ চিঠি পেলাম। তাতে ফোন নাম্বার দেয়া। আমার আবেগ আমি ধরে রাখতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম।

সে বললো, আমি তোমার শহরে, তোমার খুব কাছে। তুমি কি আমায় দেখতে আসবে?

বললাম, তোমাকে কিভাবে চিনবো?

সে বললো, আমিই তোমাকে চিনবো। তুমি শুধু একবার এসো।

মহাসমুদ্র ভালোলাগা নিয়ে দেখা করতে গেলাম। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় উপস্থিত হলাম। পরিচয় হলো এবং সেদিনই আমাকে সে আংটি পরালো। পরে আব্বু আম্মুর পর্যায়ে ব্যাপারগুলো চলে গেল। বলা হলো, ১৪ ফেব্রুয়ারিতেই আমরা বিয়ে করবো। তবে পরের বছর।

এক বছর দুর্দান্ত প্রেম করলাম। অবশেষে ২০০২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারিতেই বিয়ে হলো। আমরা ভালো আছি। ধন্যবাদ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ধন্যবাদ ভালোবাসা দিবস।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে

প্রতিবেশিনী

তারা ছিল তিন বোন। চম্পা ছিল সবার বড়। আকর্ষণীয় চেহারা। খাড়া নাক। পাশাপাশি বাড়ি ছিল আমাদের। তারা ছিল আমাদের হিন্দু প্রতিবেশী। তবু অবাধ যাতায়াত ছিল আমার। সুন্দর সম্পর্ক ছিল তাদের পরিবারের সঙ্গে।

আমি ঢাকায় পড়তাম। প্রায়ই বাড়ি আসতাম। পাশাপাশি বাড়ি বলে হোক অথবা অবাধ যাতায়াতের দরুনই হোক, কিভাবে যেন চম্পার প্রেমে পড়ে গেলাম। প্রায়ই তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম। আমাদের উঠান থেকে তাদের ঘরের খানিকটা দেখা যেতো। তার দেখা পাবার জন্য প্রয়োজন ছাড়াই এদিক–সেদিক ঘোরাঘুরি করতাম। ঢাকায় গিয়েও শান্তিতে থাকতে পারতাম না। অবস্থা শেষে এমন হলো যে কলেজ বন্ধ করে দিনের পর দিন বাড়িতে এসে থাকতাম। বেশ কিছুদিন পর লক্ষ্য করে দেখলাম চম্পাও মাঝে মধ্যে কেমন করে যেন আমার দিকে তাকায়। মনে সাহস পেলাম। ছোট একটা চিঠি লিখে সরাসরি তার পড়ার টেবিলে তার হাতে দিলাম। কয়েকদিন মানসিক কষ্ট দিয়ে ও তারপর উত্তর দিল। চিঠিতে শেষে লিখেছিল – *তোমার বাকা চোখের চাহনি আমি অনেক আগেই টের পেয়েছি।*

তার জন্য বিকেলের ফুটবল খেলা বাদ দিতে হলো। তবু বন্ধুরা মাঝে মধ্যে এসে জোর করে ধরে নিয়ে যেতো। খেলা শেষে স্কুলের মাঠে বসে আড্ডা দিতে হতো। অথচ আমার মন পড়ে থাকতো চম্পার কাছে। কোনোদিন বিকেলে যদি সে আমার দেখা না পেতো বা আমার ফিরতে সন্ধ্যা হতো তাহলে খুব অভিমান করতো। বড় চিঠি লিখে তার অভিমান ভাঙাতে হতো। মাঝে মধ্যে আমিও তার চিঠি পেতে দেরি হলে রাগ করতাম। দেখেও না দেখার ভান করতাম। এড়িয়ে চলতাম। সে খুব কষ্ট পেতো। দেখতাম খালের পাড়ে গোসল করার বা কাপড় ধোয়ার ছলে বসে রয়েছে। এক মনে পানির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। সে জানতো আমি কাছাকাছি কোথাও আছি। তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে তাকে দিয়ে আসতাম। চিঠি পেলেই সুন্দর একটা হাসি দিতো। মনে হতো পৃথিবীতে এর চেয়ে সুন্দর জিনিস বোধহয় আর নেই। ব্যাপারটা তাদের বাড়ির সবাই টের পেয়ে গেল। তাদের বাড়ির লোকজন আমাকে দেখলেই কেমন যেন করতো। কিছু বলতো না। তাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পাড়াতো এক বান্ধবীর মাধ্যমে তাকে চিঠি দিতে হতো।

এক সময় চম্পা এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হলো। আমিও বিকম পাস করে মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। দুজনার চোখে অনেক স্বপ্ন। পথে যেতে–আসতে দেখা হয়, কথা হয়। তবে দুজনেই জানতাম আমাদের মিলনে বাধা অনেক। সে হিন্দু, আমি মুসলমান। তবুও তাকে সব জানিয়ে লিখলাম। একদিন দেখা করে বললাম। চলো আমরা পালিয়ে বিয়ে করি।

পালিয়ে বিয়ে করলেই কি সমাজ মেনে নেবে? তুমি সচ্ছল পরিবারের ছেলে তোমার ভাবনা নেই। কিন্তু আমার আরো তিনটা বোন আছে। আমি হিন্দু পরিবারের মেয়ে। এভাবে পালিয়ে তোমাকে বিয়ে করলে তাদের হয়তো বিয়েই হবে না। তাছাড়া তুমিও বেকার।

তারপর অনেক কথাই বললো। তার সব কথাই বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত। তার কথায় সত্যতা ছিল। কিন্তু আমি মনে কষ্ট পেলাম।

সময় বয়ে চললো।

আমি পড়াশোনা বাদ দিয়ে বেকারত্ব ঘোচাতে সউদিতে এলাম।

অনেক দিন যোগাযোগ ছিল।

বছর খানেক পর বন্ধুদের মাধ্যমে জানলাম তার বিয়ে হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমে আসতে লাগলো।

ছুটিতে যখন দেশে এলাম, দেখলাম আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী হয়েছে সে। এক ছেলের মা চম্পাকে দেখে রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল। সারা রাত একটু ভাবনা কেন তাকে হারালাম। তার স্বামীও বিদেশে চাকরি করে। প্রায়ই সে বাপের বাড়ি আসতো। দেখা হতো, কথা হতো।

বন্ধুদের সব বললাম। তোরা যদি সঙ্গে থাকিস তাহলে এক ছেলেসহ আমি বিয়ে করতে চাই। তারা রাজি হলো না। বললো, এমনিতেই আমাদের অনেক দেরিতে এসব ঘটনা জানিয়েছিস। আমাদের যদি সব জানাতি তবে তার বিয়ে অন্য কোথাও হতে পারতো না। এখন চম্পার স্বামী–সন্তান–সংসার সবই আছে। এক সংসার ভেঙে তোর সংসার জোড়া দিতে পারবো না। তুই যাই করিস কর, আমরা নেই।

এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে বন্ধুদের কাছ থেকে ফেরত এলাম।

সব কিছু জানিয়ে চম্পাকে চিঠি দিলাম। সে সরাসরি আমার সঙ্গে দেখা করে সব শুনলো। আমাকে অনেক বোঝালো। শেষে বললো, বিয়ে করে সংসার করো। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

তারপর সব কিছু স্বাভাবিক নিয়মে ঘটলো। বিয়ে করে সংসারী হলাম। কেন যেন মনে হলো সুখী হতে পারলাম না। মনের গভীরে চম্পার জায়গায় অন্য কাউকে বসাতে পারলাম না। তবু সুখী হওয়ার চেষ্টা করলাম। সংসার পাতলাম বটে কিন্তু মনটা আমার ঘুরেফিরে চম্পার কাছেই বাধা পড়ে রইলো। ছুটি শেষে আবার সউদিতে চলে গেলাম।

দুই বছর পর চাকরি ছেড়ে চলে এলাম। চম্পা প্রায়ই বাপের বাড়ি আসতো। আমাদের ভালোবাসার কথা অনেকেই জেনে গেল। চম্পা বাপের বাড়ি আসতো আমার টানে আর আমি তো সারাক্ষণ তার আসার অপেক্ষায় থাকতাম।

আষাঢ় মাস। চম্পা এসেছে। আকাশ সারাক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি পড়ছে। আমার অখণ্ড অবসর। তাস খেলা অথবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া। সকাল থেকেই খুব বৃষ্টি। কিছুই ভালো লাগছে না। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই এক দৌড়ে চম্পাদের ঘরে ঢুকলাম। সে একা বসে আছে। দুজনে মুখোমুখি বসে অনেক কথাই বললাম।

তোমার বৌকে তুমি ভালোবাসো না, তাই না? চম্পার প্রশ্ন।

তুমি কিভাবে জানলে? আমার পাল্টা প্রশ্ন।

আমি তোমাকে দেখলেই সব বুঝতে পারি। বৌকে ভালোবাসো না কেন? জানতে চাচ্ছি।

নতুন করে আর ভালোবাসায় জড়িয়ে লাভ নেই। তোমাকে তো অনেক ভালোবাসলাম, কই আপন তো করতে পারলাম না।

বৌকে ভালোবাসো, সব ঠিক হয়ে যাবে।

হৃদয়ে আর ভালোবাসা নেই। যা ছিল সবই তো তুমি নিয়ে গেছো।

আমার কথা শুনে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল। তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো আগে কখনো বুঝিনি।

বুঝবে কেন? আমাকে কতোটুকু ভালোবাসতে সেটা তুমি জানো। কিন্তু বিশ্বাস করতে না সেটা ঠিকই বুঝি।

বিশ্বাস করবো না কেন?

করবে না এই কারণে যে, মুসলমান ছেলে যদি শেষে হিন্দু মেয়েকে ফাকি দেয়।

এসব মিথ্যা। তোমাকে সব সময় বিশ্বাস করতাম। তোমাদের অন্য বন্ধুদের কথা আমি জানি। তুমি তাদের চেয়ে আলাদা এবং এ জন্যেই তোমাকে এতো ভালোবাসি।
এতো ভালোবাসো তবে সেদিন পালিয়ে বিয়ে করতে চাইলে রাজি হওনি কেন?
এই সমাজ সংসারের ভয়ে? এই সমাজ সংসার তোমাকে সব দিয়েছে, তবু তুমি কেন সুখী হওনি?

আমার কথায় সে চোখের জল আটকাতে পারলো না। কেদে ফেললো। বললো, মানুষ বাইরের সুখটাই দেখে। ভেতরের দুঃখটা কেউ বোঝে না। তোমাকে কতো ভালোবাসি কোনোদিন হয়তো বোঝাতে পারবো না। যেখানেই যাই তোমার কথা খুব মনে পড়ে। ছেলেরা প্রেমে ব্যর্থ হলে কেউ সিগারেট খায়, কেউ মদ, কেউ বা দাড়ি রাখে। আমরা মেয়েরা সেসব কিছুই পারি না। কান্নাটাই আমাদের শেষ আশ্রয়। কেদে কেদেই আমরা কষ্ট দূর করতে চেষ্টা করি।
অনেকক্ষণ পর কান্না থামলো। চোখ মুছলো। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাড়ালো। নিঃশব্দে আমার সামনে এলো। অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর আমার মাথাটা তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো। আমি তার শরীরের মিষ্টি গন্ধটা নিঃশ্বাস ভরে নিলাম। চম্পা আবার ফুপিয়ে কেদে উঠলো।
বললাম, আবার কাদছো?
কান্নাটা আছে বলেই হয়তো বেচে আছি। এ বুকের যন্ত্রণা তুমি ছাড়া কাকে বলবো। তোমাকে কতো ভালোবাসি আর কেউ না জানুক, না বুঝুক তুমি বুঝে নিও। আমাকে কোনোদিন আঘাত দিয়ে কথা বলো না, কষ্ট দিও না।
তার চোখের জল টপ টপ করে আমার ঘাড়ে পড়তে লাগলো। কতোক্ষণ এভোবে ছিলাম জানি না। এক সময় সে আমার কপালের মাঝখানে গভীর মমতার দীর্ঘ চুমু খেলো। তখনো চোখ থেকে জল পড়ছে। কয়েক ফোটা আমার মুখের ওপর পড়লো।
বললো, ভালোবাসি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। তোমার কাছে আসতে পারি না দূরে গিয়েও থাকতে পারি না, কি যে এক যন্ত্রণার মধ্যে আছি সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কেউ জানে না।
ধীরে ধীরে সে সামলে নিল নিজেকে।
সময় কিভাবে পার হয়ে যায় কেউ জানে না। অনেক দিন বেকার রইলাম। কোরিয়া আসার প্রস্তুতি নিলাম। একদিন তার বান্ধবী বললো, চম্পা অসুস্থ, আপনাকে যেতে বলেছে।
হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। আমাকে দেখে খুব সুন্দর একটা হাসি দিল। তার মা পাশে ছিলেন। ইনজেকশন দেয়ার কথা বলে তিনি নার্সের কাছে গেলেন।
কেমন আছো?
আসতে এতো দেরি করলে কেন? তার অভিমানী প্রশ্ন।
কোরিয়া যাবার জন্য ঘোরাঘুরি করছি। তাই ব্যস্ত ছিলাম। তা তুমি কেমন আছো? কি অসুখ সব বলো।
আমার কিছু হয়নি। তুমি এসেছো, আমার সব ব্যথা কষ্ট দূর হয়ে গেছে। আমি তার কপালে, মাথায় আদর করলাম।

কতোদিন পর তোমার হাতের স্পর্শ পেলাম। খুব ভালো লাগছে। এভাবে সারা জীবন যদি আদর করতে... বলতে গিয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে দর্শনার্থী বাড়তে লাগলো। বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না।

তিন বছর হলো এসেছি। অনেক চেষ্টা করেছি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। কোনোটাতেই সফল হইনি। শেষ ভরসা ছিল বন্ধুরা। তারা চম্পার কথা জানতে চাইলে ফটিকের মতো উত্তর দেয়, আছে কোনো রকম। তাদের উত্তর শুনে আর কিছু জানার উৎসাহ পাই না।

জীবন থেমে নেই। সুখ-দুঃখে দিন ঠিকই চলে যাচ্ছে। ফেলে আসা দিনগুলো খুব মনে পড়ে। চম্পার কথাও খুব মনে পড়ে।

চম্পা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। এই প্রবাসে তোমার কথা খুব মনে পড়ে। যেখানেই থাকো, ভালো থাকো।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

সন্ধান

– নাদিরা-দিল-বারী

স্বামীর সঙ্গে সংসার শুরু করি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে। এরপর নতুন বছরে পা দিল আমার সংসার। স্বাভাবিকভাবেই নতুন স্বপ্নে বিভোর আমার দুই চোখ। আমি বরাবরই একটু রোমান্টিক ধরনের মেয়ে। আমার ভালোবাসাটা একটু প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করে। এছাড়া আমি একটু অতি রোমান্টিকও বলতে পারেন। যেহেতু সেটেলড ম্যারেজ সেহেতু স্বামীকে খুব কাছ থেকে বুঝে, দেখেশুনে এবং অতি ধীরে ধীরে ভালোবাসতে শুরু করি।

বিয়ের পর ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস খুব কাছে ছিল। তাই মন বলছিল স্বামী নিশ্চয়ই তার ভালোবাসা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করবে এবং তাতে অবশ্যই কোনো সুন্দর উপহারও থাকবে। কিন্তু সে আশা আমার আশাই থেকে গেল। স্বামীর জন্মদিন এলো, ভাবলাম ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ করা যায়। এমন একটা পন্থা খুজে বের করবো যা তার মনে অবশ্যই গেথে থাকবে। বেছে বেছে খুব সুন্দর একটা হাতঘড়ি দিলাম উপহার যাতে সে হাতঘড়িটা হাতে দিয়ে সব সময়ই আমার কথা মনে করে। এবং আজ পর্যন্ত ও সামনে যতো জন্মদিন তার আসবে, ঘড়ি আমি দিয়েই যাবো তাকে যাতে আমাকে ভুলতে না পারে প্রতিটি মুহূর্তের জন্য, চিরজীবনের জন্য।

যাহোক, যা বলছিলাম। স্বামী আমার গত বছর হঠাৎ করে একটা খুব সুন্দর বাসন্তী রংয়ের ড্রেস নিয়ে এলো আমার জন্য। আমি তো রীতিমতো হতবাক হয়ে গেলাম। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে এতো সুন্দর ড্রেস কেন?

স্বামী কানের কাছে মুখ এনে বললো, আজকে ভালোবাসার দিন। তাই তোমার জন্য আমার ছোট্ট উপহার।

পাঠক, বিশ্বাস করুন, বিয়ের পরের ভালোবাসার দিনটিতে যে দুঃখ পেয়েছি আমি তাতে আমার মনে হয়েছিল, ভালোবাসার দিন বলে কোনোদিনকে আমার মনে আর স্থান দেবো না। তাই ভুলেই

গিয়েছিলাম ভালোবাসার দিনটির কথা। এবং সেদিন হঠাৎ কেন জানি অপরাধ বোধ হতে থাকলো নিজের মনেই। আচ্ছা, এই উপহার কি বড় হলো আমার কাছে? স্বামীর মনে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসা দিবসের চিরভালোবাসার কি কোনোই মূল্য নেই আমার কাছে?

আরো আছে ভালোবাসা দিবস। জানি না গত বছরের মতো এবারও অতর্কিতে কোনো উপহার পাবো কি না স্বামীর কাছ থেকে। কিন্তু ভালোবাসা দিবসে স্বামীর মনের কোণে জমে থাকা অর্থাৎ তলিয়ে থাকা ভালোবাসার সন্ধান আমি পেয়ে গিয়েছি। না-ইবা পেলাম কোনো উপহার তাতে কি-ইবা আসে যায়!

উত্তরা, ঢাকা থেকে

কৃষ্ণপক্ষ

মনিটরের একঘেয়ে ক্লান্তিকর বিপ বিপ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বিভিন্ন ধরনের তার, নল, অক্সিজেন, মনিটর পরিবেষ্টিত হয়ে হাসপাতালের সিসিইউ-তে আছি। গত তিন মাস আগে একটানা আট দিন হাসপাতালের সিসিইউ-তে আরো জটিল অবস্থায় মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে এসেছি। বছর দেড়েক আগে নিউ ইয়র্ক সিটি-র Coney Island Hospital-এর সিসিইউ-তে সজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিলাম। তারও আগে বস্টন-এ। আমার হার্টের অবস্থা বিপজ্জনক, বেচে থাকাটা কিছুটা অনিশ্চিত। আমার বয়স একত্রিশ বছর।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে বুকের ভেতর যে কেমন করতে লাগলো, কতো কি যে মনে পড়ে গেল। একটা সময় নিজেকে নিয়ে কতো স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, মেধাও ছিল, আজো আছে সব, তবে নিজেকে নিয়ে নয়।

গত তিন বছর যাবৎ আমি মূলত একটি ছোট মাপের ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন অর্থাৎ সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা-র সঙ্গে কাজ করছি বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্র উপকুলীয় একটি প্রত্যন্ত এলাকায়। আমার মাতৃভূমিতে কিছু অসহায় দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছি। একজন শিল্পপতির ব্যক্তিগত আর্থিক দানে, সম্পূর্ণ দানভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা মূলত দরিদ্র বিধবা, দরিদ্র অসহায় মহিলা এবং স্বল্প সংখ্যক দরিদ্র অসমর্থ পুরুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। প্রায় দুই হাজার অসহায় দরিদ্র মহিলা আমাদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। আপাতত বছরে একবার শাড়ি, লুঙ্গি জাতীয় বস্ত্র দান করছি, যেসব দরিদ্র মহিলাদের ঘর নেই তাদের পর্যায়ক্রমে ঘর তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য করছি। মাঝে মধ্যে তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা, বিভিন্ন বিপদে ও চিকিৎসার জন্য নগদ আর্থিক সাহায্য, ছাত্র বৃত্তিসহ ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। উল্লিখিত এলাকার মানুষেরা বছরের আট মাস ঘরে একবেলা খেতে পারে। আমি মাঠ পর্যায়ে বেশির ভাগ সময় অবস্থান করার কারণে তারা তাদের সব অভাব, অভিযোগ, দাবি, আশা নিয়ে আসে আমার কাছে। গত তিন বছরে হাজারেরও অধিক মহিলা তাদের হাজারো অভাব-অভিযোগ, কষ্টের কথা কাদতে কাদতে আমাকে বলেছে। তাদের চারদিকে শুধু অভাব আর অভাব। এদের মূল কষ্ট ক্ষিধের জ্বালা। আমার এই ভালোবাসার মানুষের জন্য চিরস্থায়ীভাবে তিনবেলা পেট ভরে খাবারের ব্যবস্থাই করতে পারছি না। আমার বর্তমান আশা ও স্বপ্ন এদের কিছু মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী

করা। অতি সম্প্রতি একটি এনজিও-র কার্যক্রম শুরু করার জন্য কিছু দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। আমি জানি, যদি আর আট দশ বছর বেচে থাকতে পারি তবে এদের কিছু মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আমার একজন ভালোবাসার মানুষ ছিল। তার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল ইবাদতের মতো। তার প্রতি ছিল আমার পৃথিবীর সব ভালোবাসা, জেদ, আহ্লাদ, আবদার সব। সে আমাকে আদর করে ডাকতো গুটুল, হাতি, জলহস্তি... আর আমি মৌটুসী। তার দেহ-মন উজাড় করা গভীর ভালোবাসায় আমাকে তার প্রতি এমনভাবে নির্ভরশীল করে দেয় যে, সে ছাড়া আমার পৃথিবী সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়।

সে বলতো, আমি যদি হাজারো অন্যায় করি তবু তুমি কখনো আমাকে ছেড়ে যাবে না, তুমি যদি কখনো আমাকে ছেড়ে চলে যাও তবে আমি মরে যাবো অথবা পাগল হয়ে যাবো। তখন এই পাগলিকে তোমার মতো করে কে বুক দিয়ে আগলে রাখবে? আর আমি যদি কখনো তোমাকে ছেড়ে যাই তবে সেখানেই যাবো যেখান থেকে কেউ ফেরে না।

এর চেয়েও অনেক দায়িত্বপূর্ণ হাজার হাজার প্রতিজ্ঞা করেছিল লিখিতভাবেও। তখন সে ছিল প্রাপ্ত বয়স্ক, ১৮+।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা সময়ে আমার পেশাগত ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে এতো ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হই যে, যেখানে ওকে নিয়ে দুই পাচশ সিসির আধুনিক মডেলের গাড়িতে বিলাস বহুলভাবে ঘুরে বেড়াতাম সেখানে এক পর্যায়ে ওকে নিয়ে বেবিট্যাকসিতে চড়তে বাধ্য হই। সেই সময়টাতেই পাশাপাশি তার অবস্থান ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকে। আমার সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে পিতৃমাতৃহীন এই আমার সেই সময়ের একমাত্র আশ্রয় তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ভালোবাসার হাত বাড়ানোর পরিবর্তে দুর্বোধ্য হয়ে যেতে থাকে। বদলে যায়... আমার চরিত্রের কোনো নৈতিক ক্রুটি বা অন্যায় খুজে না পেয়ে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুলগুলোকে ইসু করে শস্তা, জঘন্য আচরণ করতে থাকে। আমাকে জানায়, আমার চেয়ে অনেক উচু যোগ্যতাসম্পন্ন একজনকে তার পছন্দ হয়েছে, তার পছন্দ অনুযায়ী তার পরিবারও তাকে নির্বাচন করেছে। তারপর এক সময় আমাকে ছেড়ে দেয়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সোশিওলজি ডিপার্টমেন্টে অনার্স ভর্তি হয়। ওকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টার পর সে অতীতের সম্পর্ক অস্বীকার করে। কেন যে ওর কাছ থেকে ভীষণ কষ্ট পেলে আমি সব সময় নিজের ওপরই প্রতিশোধ নিতাম। অতীতে একই ইউনিভার্সিটির একটি অনুষদের সবচেয়ে ভালো ডিপার্টমেন্ট-এর মাস্টার্স পর্যায়ের পড়াশোনা ছেড়ে দিই। ওর দেয়া আঘাত সইতে না পেরে জীবনে প্রথম অজানা ড্রাগের কাছে ছুটে যাই। নিশ্চিত ক্যারিয়ার ধ্বংস করে ফেলি। ড্রাগে ডুবে গিয়ে সব কিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করি। পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরতে থাকি, কখনো মাজারে, ফুটপাথে, লোকালয় থেকে নির্জনে, বহু দূরে একটানা সাতাশ মাস। আমি নিঃশেষ হয়ে যাই। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমার হার্ট (হৃদয়)।

তারপর আমার পরিবার থেকে আমাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। Zurich-এ পাহাড় পরিবেষ্টিত লেকের বুকে জাহাজ ভ্রমণে (River Cruise) বিশাল সৌন্দর্য উপভোগ করার পরিবর্তে অনুভব করেছি বিশাল শূন্যতা আর কষ্ট। প্যারিস-এ আইফেল টাওয়ারের একেবারে চূড়ায় দাড়িয়ে অচেনা

এক আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুচোখ ভিজে গেছে। মিলান, লন্ডন, আমেরিকা-র বিভিন্ন বিখ্যাত দর্শনীয় স্থান ঘুরে কতোবার যে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। শুধু কষ্ট আর কষ্ট।

এক সময় ড্রাগ, নস্টালজিয়া চিন্তা ত্যাগ করে নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি। কৃষ্ণপক্ষ থেকে আমি রজনীগন্ধার বৃন্তখানি যে পারে সাজাতে শুক্লপক্ষের রাতে আমার ভালোবাসা অন্যভাবে অনেক মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেবো। এখন যখন জানতে পারি, বর্তমানে ভালোবাসার হাজারো নারী আমার জন্যে আশা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে, আমার সুস্থতার জন্য চোখের পানি ফেলে প্রার্থনা করছে। তখন এক ধরনের শান্তিতে মন ভরে যায়। উল্লেখ্য ডাক্তাররা আমাকে বিয়ে না করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন যে কোনো শারীরিক পরিশ্রম নিষেধ। তার সুখী, আনন্দের জীবনের কথা চিন্তা করে সযত্নে নিজেকে রেখেছি বহু দূরে।

আমেরিকা-তে থাকতে শুনেছিলাম প্যারিস-এ অবস্থিত একটি বড় প্রাচীন চার্চ-এর কথা। সেই চার্চে গিয়ে নাকি যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। গত বছর প্যারিসে গিয়েছিলাম। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত চার্চটির সামনে পৌছে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, এতো বিশাল, অদ্ভুত আর সুন্দর! চার্চটি বিশেষভাবে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের অসংখ্য নর-নারী তাদের মনের অপূর্ণ আশা পূরণের উদ্দেশ্যে এ চার্চে আসে। চার্চে ঢুকে মনে মনে প্রার্থনার কথা চিন্তা করে মোমবাতি জ্বালাতে হয়। প্রার্থনা খাতা আছে, সেখানে মনের কথা লিখতে হয়। কথিত আছে, মনের আশা পূর্ণ হয়। আধাবেলা অন্ধকারের এক অপার্থিব পরিবেশে চার্চে প্রবেশ করে মোমবাতি জ্বালালাম। তারপর প্রার্থনা খাতায় বাংলায় লিখলাম, মৌটুসী আমার, তুমি ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, পৃথিবীর কোনো কষ্ট এবং নোংরামি যেন তোমাকে কখনো স্পর্শ না করে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

কষ্ট

– আহাম্মেদ মেহেদী

১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে রুমার সঙ্গে আমার পরিচয়। তাকে দেখে মনে হলো সে ভালো নেই। সুন্দর মায়াবী চেহারাতে কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট বেদনা লুকায়িত। এক ধরনের টান অনুভব করলাম তার জন্য। নিজ থেকেই তার সঙ্গে মিশতে চাইলাম। সাড়া পেলাম তার দিক থেকেও। এভাবে মিশতে মিশতে এক সময় ভালোবাসার বাধভাঙা জোয়ারে ভেসে গেলাম দুজন। জানতে পেলাম তার কষ্টের করুণ কাহিনী।

তার বয়স যখন ছয় মাস তখন তার মা মারা যান। রুমাই তার মায়ের একমাত্র সন্তান। রুমার বয়স যখন পাচ বছর তখন তার বাবা আবার বিয়ে করেন। পাচ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামের বাড়িতে চাচি ও দাদুর আদরে লালিত-পালিত হয় সে। বাবা ঢাকা থাকতেন। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর তাকে ঢাকা নিয়ে আসা হয়। শুরু হয় সৎ মায়ের লাঞ্ছনা আর বাবার অবহেলা। খুব অনাদর ও অবহেলায় বড় হয়েছে সে। মায়ের কোনো স্মৃতি তার মনে নেই। মায়ের কোনো ফটোও সে দেখেনি। শুনে আশ্চর্য হয়েছি যে, সে তার মায়ের নামও জানে না। এটাও কি সম্ভব? হ্যা, আমার চড়ুই পাখির (রুমা)

ক্ষেত্রে এটাও সম্ভব। নানু, মামা কারো সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। প্রথম শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে তার বাবা ইচ্ছে করেই যোগাযোগ রাখেনি।

হ্যা, এ রুমাই আজ আমার প্রিয়তমা স্ত্রী। আমার অর্ধাঙ্গিনী। প্রেমের ছয় বছরের মাথায় গত ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি আমাদের বিয়ে হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সম্পর্ক হওয়ার এক বছর পর আমি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির বিবিএ-তে চান্স পেয়ে চলে আসি। ভৌগোলিক দূরত্ব আমাদের মাঝে কোনো ফাটল ধরাতে পারেনি। আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি, *চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল নয়।* এর মধ্যে ফোন, চিঠিতে আমাদের যোগাযোগ হতো। প্রায় প্রতি মাসেই ঢাকা যেতাম।

যাহোক, আমাদের বিয়েটা হয় তার চাচা, চাচি ও দাদুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে। অনেকটা তার বাবার অমতেই। অ্যাফেয়ার ম্যারেজ ও ফ্যামিলি ম্যারেজের মাঝামাঝি পর্যায়ের একটা বাজে ধরনের বিয়ে হয় আমাদের। বিয়ের পর নিজ চোখেই দেখছি ফ্যামিলিতে তার অবস্থান আর ভাবছি, কিভাবে একটি মেয়ে এতো কষ্ট বুকে নিয়ে বেচে আছে।

বাসায় তার অবস্থা হচ্ছে নিজ ভূমে পরবাসীর মতো। মা তো নেই-ই, বাবা থেকেও নেই। দশ দিনেও একটি কথা হয় না বাবার সঙ্গে। আমার কষ্ট হয় তার বাবার জন্য। তিনি তো তার জন্মদাতা! সে তো তারই ভালোবাসার প্রথম ফসল। তিনি কিভাবে তাকে এতোটা অবহেলা করতে পারেন। অপমান, অত্যাচারের স্টিম রোলার চালান মা। আর তা সাপোর্ট করে যান বাবা। ধিক শতধিক এমন বিবেকহীন পিতাকে।

এই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসি আমার জীবনের চেয়েও বেশি। যার জন্য আমার সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। কিন্তু এ আমিই বা তার জন্য কি করতে পেরেছি? সেশন জটের করাল গ্রাসে পড়ে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিটি এখনো নিতে পারিনি। অপেক্ষায় আছি কখন পড়াশোনা শেষ হবে, কখন একটা চাকরি পাবো। জানি না ভবিষ্যতে তাকে কতোটুকু সুখী করতে পারবো। তবে এটুকু বলতে পারি, চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না। সে এমনই দুর্ভাগা, আমার মতো একটি অকর্মণ্য ছেলে তার স্বামী হয়েছে। কিছু মানুষ আছে যারা জীবনে কখনোই সুখী হয় না। সে কি তাদেরই একজন? না হলে আমি কেন স্বামী হয়েও সকল অপমান, অবহেলা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারছি না? সত্যিই আমি এক অক্ষম স্বামী!

চট্টগ্রাম থেকে

. . . অতঃপর বিয়ে এবং বিয়ে

– পাপ্পু

১৯৯৮ সালের ১৪ জুলাই সন্ধ্যার পর।

পাপ্পুভাই, পারভীন কি আপনার বাসায় এসেছে?

কথাটা তার বড় ভাই মনিরের।

কি বলছেন এসব। এতো রাতে সে আমার বাসায় কেন আসবে? ব্যাপারটা কি খুলে বলুন। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো।

আপনার সঙ্গে যাতে সম্পর্ক না রাখে সে জন্য আজ তাকে প্রচণ্ড মেরেছি। যখন দেখলাম সে কিছুতেই নতিস্বীকার করছে না তখন বাসার বাইরে বের করে রাগের মাথায় বলেছিলাম, তুই তাহলে পাপ্পুর কাছেই চলে যা এবং গেট আটকে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর গেট খুলে দেখি সে নেই, চলে গিয়েছে। ভাবলাম কোনো আত্মীয় কিংবা বান্ধবীর বাসায় গেল কি না। খোজ নিলাম সব জায়গায় কোথাও নেই। মনে হয় আপনার বাসাতেই এসেছে। দয়া করে তাকে বুঝিয়ে নিয়ে চলুন। আব্বা বলেছে, তাকে না নিয়ে যাতে বাসায় না ফিরি। আজ রাতের মধ্যে যদি তাকে না পাই তাহলে কেলেংকারি হয়ে যাবে। প্লিজ, তাকে একটু বুঝিয়ে নিয়ে আসুন। আমরা সবাই আপনাদের সম্পর্কটাকে মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ভাবছি সে তো দিনের বেলাতেই ডেট করার জন্য নতুন কোথাও নিয়ে গেলে যতোক্ষণ বাসার কাছাকাছি পৌছে দিই তার আগে পথঘাট চিনতে হিমশিম খেয়ে যায়। আর সন্ধ্যার পর একা একা কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুশ্চিন্তা গ্রাস করতে লাগলো আমাকে। সে যে আমার বাসায় নেই এ কথাটা ঘন্টা খানেক বলেও যখন অবিশ্বাস নিয়ে ফিরে গেলেন তখন আমার করার কিছুই ছিল না। শুধু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম শুধু যখন জানবো তুমি কোথায় আছো তখন এ আমিই তোমাকে আর বাসায় যেতে দেবো না। কাটলো প্রতীক্ষার রাত। ভোরে উপস্থিত হলো তার বোন সত্যিই আমার বাসায় আছে কি না পরীক্ষা করতে।

১৫ জুলাই সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টি। মন বলছে সে যোগাযোগ করবেই। ছুটে গেলাম আমার বন্ধু রানার বাসায়। ওখানেই সে সাধারণ ফোন করে। এগারোটার দিকে সে ফোন করলো হাসতে হাসতে যেন খুব মজার কাণ্ড। বললো সে চাচার বাসায় আছে।

বৃষ্টির মধ্যেই ভাইয়ের হন্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পেলাম আমার রাজকন্যাকে। ডিসিশন নিলাম বিয়ে করতে হবে। কারণ দুই একদিন পর তার বাসাতে জানবে তখন তাকে যদি বাসায় নিয়ে আটকে রেখে অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেয়। তাছাড়া তার অন্য জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। উল্লেখ্য, তার ছোট চাচার বাসায় যখন খোজ করতে এসেছিল তখন তারা বলেছিল আসেনি। কেননা এভাবে বাসা থেকে বের করে দেয়াতে তার চাচা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। পরিকল্পনা করলাম আগামীকাল কিভাবে বিয়ে সম্পন্ন করবো। কিন্তু সমস্যা পরদিন হরতাল।

১৬ জুলাই আমার বন্ধু পলাশকে বললাম তার গাড়িটা নিয়ে আসতে। হরতাল দুইটায় শেষ হবে। সে একটায় এলো গাড়ি নিয়ে। পরিকল্পনা মাফিক তার চাচার বাসার একটু দুরে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তার চাচাতো বোন বান্ধবীর বাসার কথা বলে তাকে বের করে নিয়ে এলো। রওনা দিলাম। বেইলি রোডের এক স্টুডিও থেকে আর্জেন্ট ছবি তুললাম। এলাম কাজি অফিসে। বিশ মিনিটে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলাম। বেকার ছিলাম। টাকার সমস্যা বন্ধু রানাই সমাধান করলো। সঙ্গে আরো ছিল মনির, স্বপন, সাঈদ।

দীর্ঘ ছয় বছরের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকা থেকে হলাম স্বামী-স্ত্রী। মনে শক্তি ফিরে পেলাম, এখন কেউ আমার কাছ থেকে সহজে আলাদা করতে পারবে না। তারপর তাকে চাচার বাসায় নামিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে আসি।

আজ আমরা ছোট একটা ভালোবাসার সংসার সাজিয়েছি। আগামী ২৩ মার্চ আমাদের দ্বিতীয় বিয়েবার্ষিকী। পাঠক আশ্চর্য হবেন ১৬ জুলাই না হয়ে ২৩ মার্চ!

আসল ঘটনা হচ্ছে, সেদিনের পর তাদের বাসার সবাই আমাদের প্রেমের সম্পর্কটাকে মেনে নেয় এবং স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরিবার থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেয় উভয়ের পরিবার থেকে যে, তার ডিগ্রি পরীক্ষার পর বিয়ে হবে। যদিও অপেক্ষা করতে হয় তিন বছর এবং আমরাও সেই পালিয়ে বিয়ের কথা গোপন রেখে আবার প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই থেকে যাই। উভয়ের পরিবারের কথা চিন্তা করেই আমাদের প্রথম বিয়ের কথা ভুলে যাই। অবশেষে ২৩ মার্চ ২০০১ তারিখে পারিবারিকভাবে বিয়ে সম্পন্ন হয়।

এখনো আমাদের গুরুজনেরা প্রথম বিয়ের ব্যাপারে অজ্ঞই রয়ে গেছেন। ক্ষমা চাইছি আপনাদের না জানিয়ে এ রকম কাজ করার জন্য। আসলে তখন একজন আরেকজনকে হারিয়ে ফেলার ভয় প্রচণ্ড ভাবে পেয়ে বসেছিল। পরিশেষে বলবো, ধন্যবাদ আমার সহধর্মিনীকে যে আমাকে সব রকম পরিস্থিতিতে আমার ভালোবাসায় বিশ্বাস রেখেছিল।

ঢাকা থেকে

শ্রদ্ধাস্পদেষু সম্পাদক ভাইয়া,

পত্রে আমার শত কোটি সালাম এবং অশ্রুসিক্ত ভালোবাস নেবেন।

যায়যায়দিন পত্রিকাটি দেখে চেয়ে নিয়ে ভেতরে দেখলাম নিজের ভালোবাসার কথা লিখে পাঠাতে বলেছেন।

আমার জীবনের কথা আমি লিখে পাঠালাম। শ্লীল কিংবা অশ্লীলতা আমি বুঝি। আপনিও হয়তো সে বিচার করতে বসে যাবেন আমার লেখাটি নিয়ে এবং আমাকে খারাপ কুলবধূ ভাববেন। কিন্তু যে শ্লীলতার আড়ালে চরম অশ্লীলতার মাধ্যমে পবিত্র শ্লীলতাকে পর্যুদস্ত করা হয় সে অশ্লীলতার বর্ণনা দেয়া অশ্লীল নয় বলেই মনে করি। আর আপনি যেহেতু সত্য ঘটনা লিখতে বলেছেন এবং আমার ওপর যে নির্যাতন চলছে সেগুলো যেহেতু যৌন নির্যাতন সেহেতু এগুলোর বর্ণনা দেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। বর্ণনা না দিলে বোঝাবো কি করে? জীবন যেখানে বিপন্ন সেখানে শ্লীলতার চিন্তা করি কিভাবে?

আবার শুধুই যৌনতার কথা বলি যদি তাহলে তো পাঠকরা কেবল উপভোগ করবে, কখনো জানতে পারবে না নারীর জীবনে কতো রকমের নির্যাতন আছে। শ্বশুর-ভাসুরের ভালোবাসার কি যে কষ্টে, কি যে গ্লানিতে আমার জীবন কাটছে তা আপনাদেরকে, সাংবাদিক সমাজকে জানাতে চেয়েছি যাতে করে আমাদের জন্য আপনারা কিছু করেন।

সাতশ শব্দ আমার মাথায় ছিল। সে জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু বেশি হয়ে গেছে। তবুও আমার অদ্ভুত আধার জীবনের সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিতে পেরেছি মাত্র।

ইতি

আপনাদের করুণাপ্রার্থিনী

পুতুল

পুনশ্চ : পুতুল আমার আসল নাম নয়। সঙ্গত কারণে ঠিকানাও দিলাম না। এ জন্য লেখাটি বাদ দেবেন না আশা করি। অভিধান খুজে খুজে অনেক কষ্ট করে লিখেছি।

অসহ্য

– পুতুল

গায়ের চামড়া পরিষ্কার আর শরীরটা স্লিম অথচ স্বাস্থ্যবতী হওয়ার কারণে এবং যৌবনের বাকগুলো স্পষ্ট হওয়াতে আমার দিকে তাকালে খুব দ্রুতই মানুষের দৃষ্টি স্থির হয়ে যেতো। এ জন্যই বোধহয় মানুষের মুখে মুখে আমার রূপ–যৌবনের কথা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ শ্বশুরকুলের কানে যায় এবং দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাদের ছেলের বৌ করে নেয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। এগারো ক্লাসের লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে চলি আমি ধনবান শ্বশুরবাড়িতে।

আমার স্বামী প্রবাসী। বিয়ের জন্যই দেশে এসেছিলেন। ওনার ছুটির শেষ মুহূর্তে বিয়ে হওয়াতে বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যান প্রবাসে। শ্বশুরবাড়িতে থেকে শ্বশুর–শাশুড়িদের সেবায় লেগে যাই। এর মধ্যে একটা কাজ হচ্ছে, প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে পঞ্চাশোর্ধ শ্বশুরের মাথায় তেল দিয়ে দেয়া। আমি বাড়ির ছোট বৌ। তাই এ দায়িত্ব আমার।

শ্বশুর বড় এক রুমে একা থাকেন। আর শাশুড়ি থাকেন অন্য রুমে।

কয়েকদিন পরই শ্বশুর বলেন, শরীরটাতেও একটু দিয়ে দাও।

এমনিতেই তিনি খালি গা ছিলেন, শরীরে তেল দেয়ার কথা বলে লুঙ্গিটাকে উরু সন্ধি পর্যন্ত টেনে নেন। আমি সারা দেহে তেল লাগিয়ে দিই।

দুদিন পরই বলেন, শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করছে, একটু টিপে দাও তো মা।

বাধ্য মেয়ের মতো তাও করি।

এর মধ্যে বাবার গুরুতর অসুস্থতার খবর আসে। বাবাকে দেখতে যাই এবং কবর দিয়ে আবার ফিরে আসি।

কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আবার শুরু হয় পুরনো দায়িত্ব। ইতিমধ্যে শ্বশুরআব্বাও আমার গায়ে হাত দিতে শুরু করেছেন।

আমি যখন গা টিপি তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, লক্ষী বৌমা। সে হাত ধীরে ধীরে পিঠ, কাধ এবং পিঠের নিম্নদেশে নেমে আসে। প্রতি রাতে ওনার লুঙ্গির ভেতর নড়াচড়া লক্ষ্য করি এবং লজ্জা ও আতংকে থাকি।

এক রাতে আমার আতংককে বাস্তবতা দিলেন তিনি। গা টিপছি এ সময় বলেন, তুমি তো আমাকে রোজই আদর করে দাও, আজ আমি তোমাকে আদর করে দেবো। বলেই আমাকে পাশে শুইয়ে মাথা, পিঠ, পাছায় হাত বোলাতে থাকেন, জড়িয়ে ধরেন। এক সময় মুখে, ঘাড়ে চুমু খান পাগলের মতো। পা দিয়ে পেচিয়ে ধরেন।

আমি বলি, আব্বা!

তিনি হাত পায়ে কাজ করতে করতে বলেন, লক্ষী বৌমা, আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি, তুমি একা একা কষ্ট পাবে কেন? তিনি ঘাড়ের পাশে মুখ নামান।

আমি কাকুতি করি, আমি আপনার ছেলের বৌ, আপনি আমার শ্বশুরআব্বা।

তিনি বলেন, তাতে কি? আমি কি পুরুষ না? তুমি কি নারী না? কথা না বলে লক্ষ্মী মেয়ের মতো চুপ থাকো।

তিনি আমার ব্লাউজ খুলে ফেলেন। ব্রা খুলতে না পেরে এক পাশে সরিয়ে স্তন দুটি বের করে খসখসে হাতে চেপে টিপতে থাকেন। মুখ ডুবিয়ে বাচ্চাদের মতো চোষেন। আমার ঠোঁটে মুখ ডোবান। তারপর শাড়ি-পেটিকোট নাভির ওপর তুলে ওনার লুঙ্গির মুঠো আলগা করে নিচে ছেড়ে দিয়ে শুরু করেন নারকীয় তাণ্ডব।

শান্ত হয়ে প্রথমে আমার বুকে, তারপর পাশে এলিয়ে পড়ে শ্বশুর বলেন, সকালে জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি খেয়ে নিও।

আমার স্বামীর সঙ্গে কয়েকদিন যৌন মিলন হলেও মাসিকের সময়ের তারতম্যের জন্যই হয়তো গর্ভ সঞ্চার হয়নি এবং স্বামী চলে যাওয়ার পাচ মাসেও কোনো লক্ষণ না দেখা যাওয়াতে শাশুড়িদ্বয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শ্বশুর হয়তো তাদের কাছ থেকেই জেনে নিয়েছেন আমার পেটে বাচ্চা নেই।

তারপর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই আমার ওপর শ্বশুর উঠতে লাগলেন। এখন আমার সব কাপড়ই খুলে নেন। তিনিও আর লুঙ্গিটাকে পায়ে রাখেন না।

এসবের মাঝে আমার বড় ভাসুর একদিন রাতে আমাকে ডেকে নিলেন বৈঠক ঘরে। মুখোমুখি বসিয়ে বলেন, এসব কি শুরু করেছো?

আমি কিছু না বুঝে বলি, কি ভাইজান?

আব্বার সঙ্গে প্রতি রাতে এসব কি করছো? লোকজনকে বলি যদি তখন কি হবে?

আতংকে কেদে ফেলে বলি, আমার দোষ কি বলুন? আব্বা এসব করলে, আমি কি করবো?

ভাসুর তখন বলেন, তুমি বাধা দেবে না? বৃদ্ধ শ্বশুরের সঙ্গে এসব করতে হবে? তারপর নরম গলায় বলেন, আমি আছি না? আমারই তো ছোট ভাইয়ের বৌ তুমি। তোমাকে প্রথম দেখেই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। কি মায়া মায়া চোখ। এসো একটু ভালোবাসি। বলে আমার স্বামীর মায়ের পেটের বড় ভাই আমার বস্ত্র হরণ করে ঝাপিয়ে পড়লেন আমার ওপর।

একটানা অনেকক্ষণ কুপিয়ে থামলেন তিনি। বললেন, এখন থেকে সব সময় তোমাকে ভালো করে আদর করে দেবো আমি। তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না। এটাতে হবে না? তিনি তৃপ্তির হাসি হেসে নেতিয়ে পড়া বিশাল পুরুষাঙ্গ দেখান আমাকে। তোমার এটাও খুব সুন্দর, টাইট বলে আমার অঙ্গে হাত দিয়ে ঘাটাঘাটি করতে থাকেন। একটু পর আবারও চড়েন। তারপর আরো একবার শরীর দিয়ে ছাড়া পাই।

তখন থেকে পালা করে দুই বাপবেটাকে শরীর দিচ্ছি। মাঝে মধ্যে মনে হয় ছেলে যেমন বাবার সঙ্গে আমার শোয়ার খবর জানে তেমনি বাবাও জানে ছেলের সঙ্গে শোয়া। আবার নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করে ভাবি, একদিন হয়তো বাপ-বেটা দুজনেই দুদিক দিয়ে এক সঙ্গে শুরু করবে। কখনো একই রাতে দুজনের কাছে যেতে হয়। এক থেকে দুই দিন একজনের কাছে না গেলে সহ্য করলেও তিন থেকে চার দিন না গেলেই শুরু হয় অত্যাচার। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন শ্বশুরের আদেশ অগ্রাহ্য করলে চতুর্থ দিন চলে আসার সময় হাত ধরে হেচকা টানে শুইয়ে দেন। টেনে হেচড়ে কাপড়-চোপড় খুলে তিন দিন

অবহেলার শোধ তুলেন বিভিন্ন নির্যাতনে যেন আমি ওনার কেনা দাসী। অসহ্য যন্ত্রণা দেন তবু সামান্য আওয়াজ করে চিৎকার করতে পারি না।

ভাসুরের অত্যাচার আরো ভয়াবহ। ভাসুর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বৈঠক ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করেন। তিন দিন, চার দিন না গেলে পঞ্চম দিনে আমার রুমে চলে আসেন। আমার একার আস্ত রুমটা পেয়েছি ভাসুরেরই সুপারিশে। দরজায় দাড়িয়ে বলেন, কথা আছে, শুনে যাও তো। বৈঠক ঘরে গেলেই দাত কিড়মিড়িয়ে *ফাকিবাজ* বলে গায়ের জোরে বস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে নিজের বিশাল শরীর থেকে সব পোশাক খুলে আমার উপর উপুড় হয়ে হাত, পা, মুখ দিয়ে শুরু করেন অত্যাচার। তিনি ঈর্ষায়, ক্রোধে আমার স্তনের শেপ বা সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্যই হয়তো মুখে পুরে নিয়ে কামড়ে ধরে মাংসপিণ্ড দাতে আটকিয়ে জোরে টান মারেন। একটা স্তন দুই হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে খামচে ধরেন, মুচড়ে ধরে বোটায় দাত বসিয়ে দেন। তারপর অন্যটাতেও এ রকম করেন। সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠি। তখন এক হাতে আমার মুখ চেপে ধরেন।

এভাবে বিরামহীন অত্যাচারের কারণে ইতিমধ্যেই আমার আকর্ষণীয় দেহলতার বাধন খসে ঢিলে হয়ে গেছে। আমি এবং শ্বশুরকুল ভালো আছেন এ কথা জানিয়ে শ্বশুর-ভাসুর-শাশুড়িরা স্বামীকে দেশে আসতে নিষেধ করছেন মুহুর্মুহু চিঠিতে। আমিও আসতে বলতে পারি না। তাহলে শ্বশুরবাড়িই ছাড়তে হবে। কারণ আমি জানি, আমার স্বামী বাপ-মা, ভাইভক্ত এবং তাদেরকে প্রচণ্ড ভয় পান, শ্রদ্ধা করেন, বিশ্বাস করেন। স্বামীর কাছে নালিশ করলেও ফল আমার প্রতিকূলেই যাবে।

আমি অসহায়। সব ছেড়েছুড়ে দরিদ্র বিধবা মায়ের বোঝা হতে ইচ্ছে করে না। আমি এও জানি, শ্বশুরবাড়ির প্রতি আমার উদ্ধত আচরণ আমার অশিক্ষিত মাও মেনে নেবেন না।

আমার দিন কাটে না। আধার রাত ফুরাতে চায় না। আমি দ্বিধায় আছি আত্মহত্যা করবো কি করবো না। এই কষ্ট এবং যন্ত্রণাভরা গ্লানিকর জীবন বয়ে বেড়াতে আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু না মরে ভালোভাবে বাচতেও খুব ইচ্ছা হয়। সে জন্যই বোধ করি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি।

নাম ঠিকানাবিহীন

লেখিকার প্রতি অনুরোধ : *আত্মহত্যার চিন্তা কখনোই করবেন না। আত্মহত্যার মানে হবে পরাজয় বরণ করা। আমরা চাই আপনি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হোন। তাই অন্যভাবে জীবন গড়তে চাইলে আপনি সম্পাদকের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করুন। সকল গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। আপনার মঙ্গল আমরা সবাই কামনা করি।* ***– যাযাদি***